পৃথিবীর ইতিহাস

প্রথম ভাগ

শ্রীগোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ম্যাকমিলান এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড

1793 4867 278

Approved by the Board of Secondary Education,
West Bengal, as a textbook for Class VI.
Vide Notification No. Syl./69/54, dated 8th December, 1954.

পৃথিবীর ইতিহাস

2008

প্রথম ভাগ

(ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য)

STATE INSTITUTE OF EDUCATION BANIPUR

শ্রীগোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম.এ., পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন)
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এবং

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম.এ.
ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক, রাণী ভবানী স্কুল, কলিকাতা

প্রণীত

S.C.E.R.T. West Bengal Library

ম্যাকমিলান এণ্ড কোং লিমিটেড
২৯৪, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
১৯৬৬

MACMILLAN AND COMPANY LIMITED
LONDON BOMBAY CALCUTTA MADRAS MELBOURNE

THE MACMILLAN COMPANY OF CANADA LIMITED
TORONTO

ST MARTIN'S PRESS INC
NEW YORK

ERT, W.B LIBRARY
8.8.92
en. No.... 9175

This book is copyright in all countries which are signatories to the Berne Convention.

First Edition 1954
Reprinted 1958, 1959, 1961 (*twice*), 1962, 1963, 1964 (*twice*), 1965, 1966

MADE IN INDIA
PRINTED BY B. MUKHERJI AT KALIKA PRESS PRIVATE LTD.
25, D. L. ROY STREET, CALCUTTA-6

E/278

সূচী


খ্রীষ্টপূর্ব
১০ হাজার
প্রস্তর যুগের মানুষ ও অস্ত্রশস্ত্র
চাষবাস
৪ হাজার
সুমেরীয়
পিরামিড
মোহেঞ্জোদরো
হামুরাবি
২ হাজার
ইনের স্তূপ
আর্য ঋষি
ফিনিসীয় বণিক
মোজেস্
১ হাজার
হোমার
আসিরীয় যোদ্ধা
বুদ্ধ
কনফুসিয়াস
৫০০
দারায়ুস্
পেরিক্লিস্
আলেকজাণ্ডার
অশোক
হ্যানিবল
অগাষ্টাস্
খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভ
যীশু
কনিষ্ক
কনস্ট্যানটাইন
খ্রীষ্টাব্দ ৫০০
সমুদ্রগুপ্ত

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীনকালের মানুষের কথা কি করে জানা যায়?

যাদের আমরা কখনও চোখে দেখিনি তাদের কথা কি করে জানা যায়? তোমরা হয়ত বলবে, যাঁরা তাদের দেখেছেন তাদের কাছ থেকে সে কথা জেনে নেবে বা তখনকার কোন বই থেকে পড়ে নেবে। কিন্তু পৃথিবীতে মানুষের জন্ম হয়েছে হাজার হাজার বছর আগে। এই অতি প্রাচীন যুগের কথা জানতে হলে কি করবে? সে সময়কার কোন লোক আজ বেঁচে নেই। প্রথম যুগের মানুষেরা লিখতেও জানত না। বহু যুগ পরে অবশ্য তারা লিখতে শিখেছিল। সে সময়ের পুঁথিপত্রও প্রায় সবই নষ্ট হয়ে গেছে। তাই প্রাচীন কালের মানুষদের কথা জানা সহজ নয়। কি করে আমরা তাদের কথা কিছু কিছু জানতে পারি সে কথাই এখন তোমাদের বলছি।

ধর, তোমরা হয়ত কেউ কেউ তোমাদের পিতামহ কিংবা প্রপিতামহকে দেখনি। কিন্তু বাড়ীতে তাঁদের ছবি আছে। এই ছবি দেখে তোমরা বলতে পার যে তাঁরা কেমন দেখতে ছিলেন, বা কি রকম পোশাক পরতেন। বাড়ীতে যদি তাঁদের আমলের কোন বই থাকে তা'হলে সেগুলি দেখে বুঝতে পারবে যে তাঁরা কি ধরনের বই পড়তেন। তাঁদের লেখা হিসাবের খাতা যদি পাওয়া যায়, তবে সহজেই জানা যাবে সেকালে কোন্ জিনিসের কি দাম ছিল। এইভাবে তাঁদের কালের লোকদের সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়।

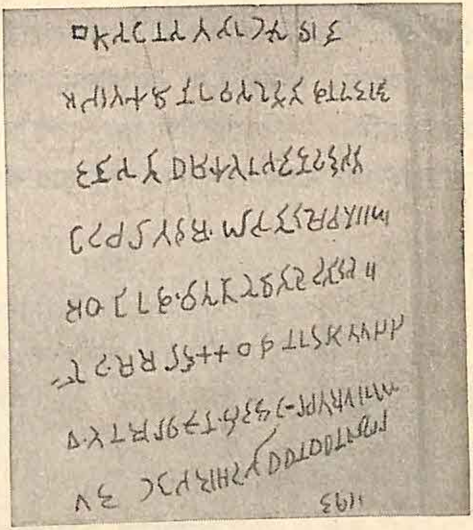
সেই রকম প্রাচীন কালের মানুষদের ছবি অথবা তাদের ব্যবহার করা জিনিসপত্র যদি পাওয়া যায়, তা হলে এই একই উপায়ে

আমরা তাদের কথা কিছু কিছু বলতে পারি। তখনকার লোকেরা যে সব জিনিসপত্র ব্যবহার করত সেগুলি ক্রমে মাটির নীচে চাপা পড়ে গেছে। তার মধ্যে কোন কোন জিনিস কখনও কখনও মাটি খুঁড়ে পাওয়া যায়। পৃথিবীর নানা জায়গায় বহু পুরানো অস্ত্রশস্ত্র, গুহার দেওয়ালে আঁকা শিকারের ছবি, পাত্র, অলঙ্কার এবং আরও অনেক জিনিস এইভাবে পাওয়া গেছে। এমন কি পুরানো শহর, নানা ধরনের ঘরবাড়ী, মঠ, মন্দির প্রভৃতিও মাটির নীচে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব দেখেই সেকালের মানুষের কথা জানতে পারি। এগুলি কবে তৈরী হয়েছিল তাও পণ্ডিতেরা মোটামুটি বলতে পারেন। কিন্তু মাটি খুঁড়ে পাওয়া জিনিসপত্র দেখে সেকালের সব কথা জানা যায় না; কিছুটা কল্পনা করে নিতে হয়, আর অনেকখানিই অজানা থেকে যায়।

অনেক সময়ে প্রাচীন যুগের মঠ, মন্দির বা বাড়ীর দেওয়ালে, অথবা পাথরের টুক্‌রো বা থামের ওপর খোদাই করা লেখাও পাওয়া যায়। এই রকম লেখাকে বলা হয় "উৎকীর্ণ বা খোদিত লিপি"। কোন রাজা হয়ত যুদ্ধে জয়লাভ করে তাঁর বীরত্ব-কাহিনী পাথরে খোদাই করে গেছেন। আবার কেউ হয়ত মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তার দেওয়ালে নিজের নাম ধাম লিখে রেখে গেছেন। আমাদের দেশের রাজা অশোক পাহাড়ের গায়ে এবং পাথরের থামে প্রজাদের জন্য অনেক উপদেশ খোদাই করিয়ে-ছিলেন। এই রাজাদের বিষয় জানতে লিপিগুলি আমাদের অনেক সাহায্য করে। প্রাচীন লিপিগুলির ভাষা বা অক্ষর কিন্তু আমাদের এখনকার মত নয়। তাই এগুলি পড়া সহজ নয়। যাঁরা প্রাচীন কালের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেন তাঁরা এই সব লিপি পড়তে শিখে-ছেন এবং তাতে কি লেখা আছে তা বুঝতে পারেন। এমন সব

খোদাই করা লেখাও পাওয়া গেছে যা আজও কেউ পড়তে পারেন নি। তবে পণ্ডিতেরা আশা ছাড়েননি ; সেই লেখাগুলো পড়বার চেষ্টা এখনও চলছে।

খোদাই-করা লিপি ছাড়া মাটির নীচে কখনও কখনও প্রাচীন যুগের কিছু কিছু মুদ্রাও পাওয়া যায়। কোন কোন মুদ্রার উপর সেকালের রাজাদের চেহারার ছাপ এবং সন-তারিখ লেখা আছে। তাই সে যুগের মুদ্রা থেকেও অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার কথা জানা যায়।



অশোকের শিলালিপি

তখনকার লোকদের কথা সবচেয়ে বেশী জানা যায় সেকালের যা কিছু পুঁথিপত্র পাওয়া গেছে তা থেকে। যেমন বেদ, রামায়ণ, মহাভারত থেকে আমরা আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কাহিনী জানতে পারি।



প্রাচীন যুগের মুদ্রা

সে যুগে এখনকার মত কাগজ তৈরী হত না, আর ছাপাখানাও

ছিল না। তাই বইগুলি লেখা হ'ত তালপাতা, মাটির টালি, চামড়া প্রভৃতির উপর।

প্রাচীন কালের কথা আজও আমরা খুব বেশী জানতে পারিনি। পণ্ডিতেরা অনেক কাল ধরে তা জানবার চেষ্টা করছেন। তাই পঞ্চাশ বছর আগে আমরা যা জানতাম, আজ তার চেয়ে অনেক বেশী জানি। ভবিষ্যতে আরও বেশী জানব। হয়ত একদিন তোমরাই কত নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করবে।

প্রশ্ন

১। মাটি খুঁড়ে প্রাচীন কালের কি কি জিনিসপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে?

২। কি কি উপায়ে আমরা প্রাচীন কালের মানুষদের কথা জানতে পারি?

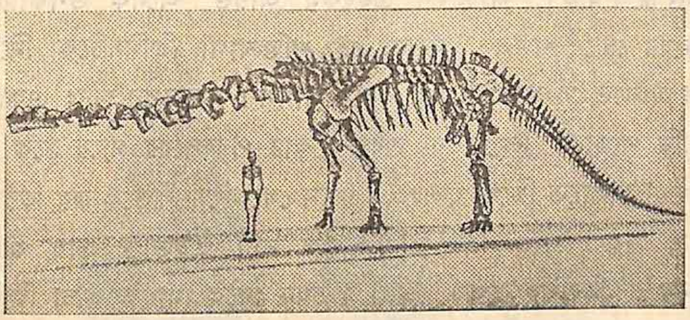
দ্বিতীয় অধ্যায়

আদিম যুগের মানুষ

পৃথিবীতে এখন আমরা নানারকম জীবজন্তু, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত দেখতে পাই। কিন্তু পৃথিবীর যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখন এসব কিছুই ছিল না। কোটি কোটি বছর আগে সূর্যের একটি অংশ থেকে এই গ্রহটির জন্ম হয়েছিল। তখন এটি ছিল একটি আগুনের গোলার মত।

তারপর বহু যুগ কেটে গেল। পৃথিবীর দেহটিও ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হল। তখন অনেক ওলট-পালটের পর পৃথিবীর উপর সমুদ্র, নদীনালা এবং পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি হল। গাছপালা ও

জীবজন্তুরা দেখা দিল আরও অনেক কাল পরে। আদিম যুগের অধিকাংশ জীবজন্তু ছিল এক একটি বিরাট দৈত্যের মত,—মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রায় একশ' ফুট লম্বা, আর সেই অনুপাতেই উঁচু। তারা বহুদিন হল পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু আজও পাহাড়ের গায়ে এবং মাটির নীচে এদের কঙ্কাল দেখতে পাওয়া যায়। এইসব কঙ্কাল সংগ্রহ করে দেশবিদেশের যাদুঘরে রেখে দেওয়া হয়েছে যাতে সবাই সেগুলি দেখতে পারে।



আদিম যুগের অতিকায় জন্তুর কঙ্কাল

মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল সবার শেষে। প্রথম যুগের মনুষেরা কিন্তু ঠিক এখনকার মানুষের মত ছিল না। তাদের চেহারার সঙ্গে বরং বনমানুষদের চেহারারই বেশী মিল ছিল। তাদের আচার-ব্যবহারও ছিল জন্তুর মত। তারা গাছের কোটরে বা পাহাড়ের গুহায় থাকত, আর খাদ্যের সন্ধানে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াত। বনের পশু শিকার করে বা গাছের ফলমূল সংগ্রহ করে তারা জীবন ধারণ করত। এগুলি তারা কাঁচাই খেত ; কারণ আগুনের ব্যবহার তাদের জানা ছিল না। তারা কাপড় চোপড়

পরতেও জানত না। তবে মানুষের বুদ্ধি ছিল অন্য সব জন্তুর চেয়ে অনেক বেশী ; তাই প্রকৃতির শক্তিগুলিকে নিজের বশে এনে ক্রমে সে প্রাণীজগতের রাজা হয়ে বসল।

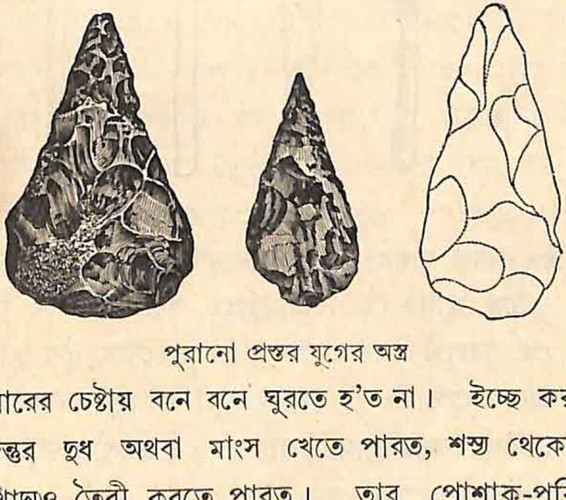
আগুন জ্বালাবার কৌশল আবিষ্কার করেই মানুষ সর্বপ্রথম প্রকৃতিকে জয় করতে শিখেছিল। বনে তখন প্রায়ই আগুন লাগত। মানুষ দেখল, আগুনের শক্তি অনেক ; যে জানোয়ারেরা মানুষের অনিষ্ট করতে পারে তারাও আগুনকে ভয় করে। এর তাপে শীতও চলে যায়। আগুনের এইরকম আরও অনেক উপকারিতা মানুষের চোখে পড়ল। তখন এই শক্তিশালী জিনিসটিকে নিজের বশে আনতে সে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। তারপর হঠাৎ একদিন দুখানি পাথরের টুক্‌রো বা শুকনো কাঠ পরস্পরের গায়ে ঠুকে সে আগুন জ্বালাতে শিখে ফেলল। তখন থেকে সে শীতকে জয় করল ; হিংস্র জন্তুর ভয়ও আর তার থাকল না। এইভাবে তার জীবন অনেকটা নিরাপদ হল। এছাড়া তখন থেকে মানুষ কাঁচা জিনিস না খেয়ে সেগুলি আগুনে পুড়িয়ে খেতে শুরু করল।

মানুষ ক্রমে পাথর দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে আরম্ভ করল। গোড়ার দিকের তৈরী এই অস্ত্রশস্ত্রগুলি বিশেষ ভাল ছিল না। কিন্তু এগুলি দিয়ে মাটি খুঁড়বার ও জীবজন্তু শিকার করবার কিছু সুবিধা হয়েছিল। এই সময় থেকেই মানুষ জীবজন্তুর চামড়া দিয়ে নিজের দেহ আবৃত করতে শেখে।

এইভাবে অনেক কাল কেটে যায়। তারপর মানুষের জীবনে আবার পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। এই নতুন যুগের মানুষেরা তাদের পূর্বপুরুষদের চাইতে আরও ভাল, আরও চকচকে, আরও ধারাল অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে শিখল। এগুলিও ছিল পাথরের। গাছের

কোটরে বা পাহাড়ের গুহায় না থেকে তারা ডালপালা কেটে ঘর তৈরী করে বাস করতে লাগল। যারা হ্রদের কাছে থাকত তারা অনেকে জলের মধ্যে মাচা বেঁধে তার ওপর ঘর তৈরী করত। বোধ হয় এটা ছিল হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাবার ব্যবস্থা।

এর পর মানুষ আরও এক ধাপ এগিয়ে এল। এতকাল সে ছিল শিকারী, এখন হল সে পশুপালক। গরু, ভেড়া, মোষ প্রভৃতি পশুকে সে ঘরে রেখে পুষতে লাগল। চাষ করে ফসল ফলাবার কৌশলও সে আবিষ্কার করল। তখন তাকে

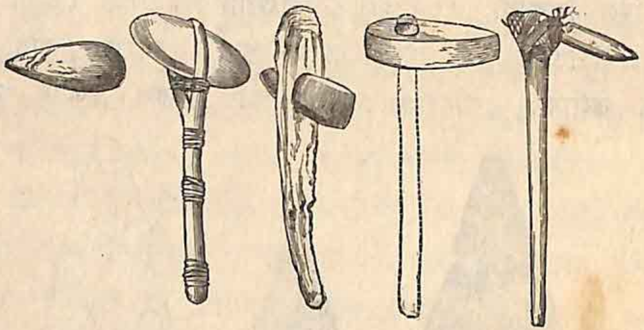


পুরানো প্রস্তর যুগের অস্ত্র

আর খাবারের চেষ্টায় বনে বনে ঘুরতে হ'ত না। ইচ্ছে করলেই সে পোষা জন্তুর দুধ অথবা মাংস খেতে পারত, শস্য থেকে অনেক রকমের খাদ্যও তৈরী করতে পারত। তার পোশাক-পরিচ্ছদেরও অনেক পরিবর্তন হল। ভেড়ার লোম, গাছের আঁশ বা বাকল দিয়ে সে কাপড় বুনে পরতে লাগল। শস্য সঞ্চয় করে রাখবার জন্য ও রাঁধবার জন্য সে মাটির পাত্র তৈরী করতেও আরম্ভ করল।

মানুষ যখন শুধু শিকারী ছিল, তখন সে ছিল যাযাবর। নতুন নতুন শিকারের সন্ধানে তাকে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে হত,

তাই তার থাকবার কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না। কিন্তু এবার তাকে চাষের কাজের জন্য স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধতে হল। যখন অনেক লোক এক জায়গায় এসে চাষবাস করতে লাগল, থাকবার জন্য ঘর-বাড়ী তৈরী করল, তখন আস্তে আস্তে সেখানে গ্রামের সৃষ্টি হল। এই ভাবে সেই নতুন যুগের মানুষের জীবনের ধারা সম্পূর্ণ বদলে গেল।



নতুন প্রস্তর যুগের অস্ত্র

এতদিন পর্যন্ত মানুষ কেবল কাদামাটি আর পাথরের টুক্‌রোই ব্যবহার করতে জানত। কিন্তু আরও কয়েক হাজার বছর পরে মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখে ফেলল। তখন থেকে সে ধাতু দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র এবং যন্ত্রপাতি তৈরী করতে আরম্ভ করল। মানুষ প্রথমে আবিষ্কার করে তামা, তারপরে ব্রোঞ্জ এবং সবচেয়ে শেষে লোহা। এখন থেকে প্রায় তিনহাজার বছর আগে মানুষ প্রথম লোহার ব্যবহার শিখেছিল। ধাতু ব্যবহার করতে শেখার পর থেকেই মানুষের খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি হয়; সে পুরোপুরি সভ্য হয়ে উঠতে থাকে।

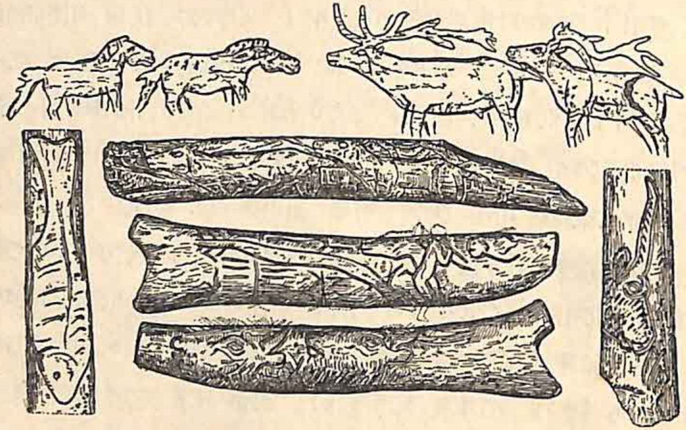
এই সব নানা প্রকারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আদিম যুগে মানুষের মনেরও অনেক উন্নতি হয়েছিল। সাধারণ জীবজন্তুরা মনের

ভাব কথা দিয়ে প্রকাশ করতে পারে না। সম্ভবতঃ প্রথম মানুষেরাও তা পারত না। কিন্তু তাদের বংশধরেরা নানারকম শব্দ করে মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখেছিল। একই জিনিস বোঝাবার জন্য বিভিন্ন দেশের লোকেরা বিভিন্ন রকম শব্দ ব্যবহার করত। এই সব ভিন্ন ভিন্ন শব্দ থেকেই নানা দেশে নানা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

আদিম মানুষেরা দেখত নদীর জল না পেলে শস্য জন্মায় না, সূর্যের তাপ ও আলো না পেলে ফল পাকে না, আগুন না হলে রান্না হয় না ; এই রকম আরও কত কি! প্রকৃতির এই সব শক্তি তাদের মনে ভয় ও বিস্ময় জাগিয়ে তুলেছিল। তারা মনে করত এরা বুঝি খুব শক্তিশালী এবং যা খুশি তাই করতে পারে। তাই তারা এই সব শক্তিকে সন্তুষ্ট করবার জন্য তাদের পূজা করতে শুরু করল। এইভাবে অতি প্রাচীন যুগে মানুষের ধর্মজীবনের সূচনা হয়েছিল।

তখনকার মানুষের মনে ধীরে ধীরে সৌন্দর্যবোধও জেগে উঠেছিল। তারা নিজেদের দেহে রং মাখাত, রং-বেরং-এর পাথর আর ঝিনুকের মালা পরত। নানারকম মাটির পাত্র তৈরী করে তার উপর তারা নকসা আঁকত, এবং তাতে রং মাখিয়ে দিত। অনেকে ছবি আঁকতেও শিখেছিল। সেকালের পাথর ও হাড়ের উপর আঁকা জীবজন্তুর ছবি অনেক পাওয়া গেছে। স্পেন দেশের আলতামিরা গুহায় আঁকা রঙ্গীন ছবিগুলি দেখলে বিস্মিত হয়ে যেতে হয়। এই সব ছবিতে জীবজন্তুগুলো যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

তোমরা হয়ত লক্ষ্য করেছ, এক দেশের মানুষের সঙ্গে আরেক দেশের মানুষের চেহারার অনেক পার্থক্য। কেন এরকম হয়? এর জবাব দেওয়া সহজ নয়। তবে বেশীর ভাগ পণ্ডিতই মনে করেন যে পৃথিবীর সব জাতি, সব বর্ণের মানুষের



আদিম যুগের মানুষের আঁকা ছবি

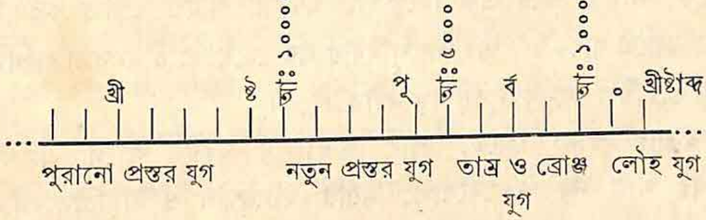


আলতামিরা গুহার একটি ছবি

জন্ম হয়েছে একই মূল থেকে। ক্রমে তারা দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তারপর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রকমের জলহাওয়ার মধ্যে বাস করতে করতে তাদের দেহের ও রঙের পরিবর্তন ঘটেছে।

পৃথিবীতে এখন তিনটি প্রধান জাতি দেখা যায়। এদের মধ্যে এক দলের গায়ের রং সাদা—যেমন ইউরোপের অধিবাসীদের ; আরেক দলের রং কালো—যেমন নিগ্রোদের; আর অন্য দলটির হলদে—যেমন চীনাদের। পৃথিবীতে বিশুদ্ধ জাতির লোক পাওয়া খুবই কঠিন ; প্রায় সব দেশেই এক জাতির লোক অন্য জাতির লোকের সঙ্গে মিশে গেছে। আমরা ভারতবাসীরা এই রকম একটি মিশ্রিত জাতি।

যুগরেখা



প্রশ্ন

১। প্রথম যুগের মানুষেরা কিভাবে জীবন যাপন করত ?

২। আগুনের ব্যবহার শিখে আদিম যুগের মানুষের কি সুবিধা হয়েছিল ?

৩। মানুষ প্রথমে কোন্ কোন্ ধাতুর ব্যবহার শেখে এবং তাতে তাদের কি উন্নতি হয় ?

৪। যাযাবর মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করল কেন ? তখন তাদের জীবনযাত্রার কি পরিবর্তন হয়েছিল ?

৫। প্রথম যুগের মানুষের ধর্মজীবনের সূচনা কেমন করে হল ?

৬। আদিম মানুষের সৌন্দর্য-বোধের কি পরিচয় পাওয়া যায় ?

৭। এক দেশের মানুষের সঙ্গে আর এক দেশের মানুষের পার্থক্য দেখা যায় কেন ?

তৃতীয় অধ্যায়

মানব জাতির আদি সভ্যতা

আদিম অবস্থা থেকে মানুষের পরিবর্তন হয়েছিল খুব ধীরে ধীরে। পৃথিবীর সব জায়গাতে এ পরিবর্তন একই সময়ে হয়নি। কোথাও এই পরিবর্তন এসেছে অনেক আগে, কোথাও বা পরে। যাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা একটু ভাল ছিল, তাদের মধ্যেই এসব পরিবর্তন খুব তাড়াতাড়ি দেখা দিয়েছিল।

মানুষ যখন চাষবাস করতে শুরু করে তখন তারা যেতে থাকে নদীর ধারে ধারে ; কারণ জল না হলে চাষ হয় না। সে সময় থেকেই এই সব ভবঘুরে মানুষেরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করে এবং নিজেদের অবস্থার আরও উন্নতি করবার চেষ্টা করতে থাকে। এইজন্য পৃথিবীর সব চেয়ে প্রাচীন সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল কয়েকটি বড় বড় নদীর তীরে।

যতদূর জানা গেছে, প্রায় ছ'হাজার বছর আগে মিশর দেশের নীল নদ ও মেসোপটেমিয়ার ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরের লোকেরাই সবচেয়ে আগে সভ্য হয়ে উঠেছিল।

আদিম মানুষেরা গ্রামে বাস করত, কিন্তু প্রাচীন মিশর ও মেসোপটেমিয়াবাসীরা শহর গড়ে তুলেছিল। এই সব শহরে তারা বড় বড় প্রাসাদ, দেবমন্দির এবং সমাধিগৃহ নির্মাণ করত। এগুলির ধ্বংসাবশেষ আজও আমরা দেখতে পাই। চাষবাস ছাড়া এরা নানারকমের শিল্পের কাজও করতে জানত। রাস্তাঘাট, যানবাহন তৈরী করে তারা ব্যবসা-বাণিজ্যও শুরু করেছিল। আদিম যুগের মানুষের মত নিজেদের প্রয়োজনীয় সব কিছু কাজ একা একা না করে, এদের একেকটি দল একেকটি কাজ বেছে নিয়েছিল।

লিখবার পদ্ধতিও এরাই প্রথম আবিষ্কার করে। প্রথম প্রথম ছবি এঁকে এরা মনের কথা বোঝাবার চেষ্টা করত। যেমন ধর, একটি শিকারের ঘটনা জানাতে হবে। এজন্য প্রথমে এরা শিকারের একটি সম্পূর্ণ ছবি আঁকত। কিন্তু তাতে নানারকম অসুবিধা দেখে তারা ক্রমে ছবিটি পুরোপুরি না এঁকে কতকগুলি ইঙ্গিত বা চিহ্ন দিয়ে ব্যাপারটি বোঝাবার চেষ্টা করতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন শব্দের জন্য এরা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করতে শুরু করে। এইসব চিহ্ন থেকেই পরে বর্ণমালার সৃষ্টি হয়েছে।

মিশর—মিশর দেশটি আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এই দেশটির মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে নীল নদ, আর পশ্চিমে রয়েছে দিগন্তবিস্তৃত সাহারা মরুভূমি। নীল নদের দুই তীরে প্রথম যে সব মানুষেরা বসতি স্থাপন করেছিল, তারা পৃথক্ পৃথক্ দলে বিভক্ত হয়ে বাস করত। প্রত্যেক দলের উপর একজন করে দলপতি থাকতেন। দলগুলির পৃথক্ পৃথক্ রাজধানী ও পৃথক্ দেবদেবী ছিল।

মিশরের জলবায়ু খুব গরম এবং শুকনো। এখানে বৃষ্টি একেবারে হয় না বললেও চলে। তাই নীল নদ না থাকলে মিশর সাহারার মতই মরুভূমি হয়ে যেত। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মের সময়ে নীল নদের দুই তীর বন্যার জলে ভেসে যায়, আর আশেপাশের জমিগুলি জল ও পলিমাটি পেয়ে উর্বর হয়ে ওঠে। মিশরের যা কিছু শস্যসম্পদ তা এই বন্যার জলের উপরই নির্ভর করে। এইজন্যই বলা হয়, মিশর "নীল নদের দান"।

কি করে এই বন্যার জল ধরে রাখা যায়, এই ছিল প্রাচীন মিশরবাসীদের প্রধান সমস্যা। বড় বড় বাঁধ তৈরী করে এবং খাল কেটে তারা এই সমস্যার সমাধান করেছিল। এই কাজের

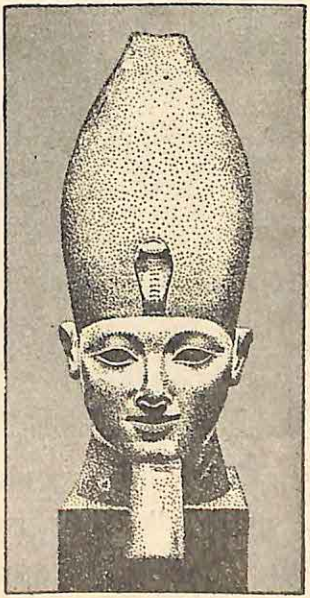


প্রাচীনতম সভ্যতার কেন্দ্রস্থল

জন্য বহু লোকের প্রয়োজন হ'ত। তাই ভিন্ন ভিন্ন দলের লোকেরা একত্র হয়ে এই কাজ করতে আসত। এর ফলে প্রাচীন মিশর-বাসীদের পরস্পরের মধ্যে মিলনের সূত্রপাত হয়। অবশেষে সমগ্র মিশর জুড়ে একটি বড় রাজ্য গড়ে ওঠে।

প্রায় তিন হাজার বছর ধরে ভিন্ন ভিন্ন বংশের রাজারা মিশরে রাজত্ব করেন। রাজাদের উপাধি ছিল "ফেরো"। প্রজারা তাঁদের দেবতার মত সম্মান করত।

মিশরের অধিবাসীরা প্রথমে যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পটু ছিল না। এক সময়ে পশ্চিম এশিয়া থেকে একদল লোক এসে মিশর জয় করে। ইতিহাসে এদের বলা হয় "হিক্সোজ্" বা মেষপালক রাজা। এরা ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে যুদ্ধ করত। মিশরে এরাই সর্বপ্রথম ঘোড়ার প্রবর্তন করেছিল।



মিশর-রাজ তৃতীয় থাটমোস

এই বিদেশী শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে ক্রমে মিশরবাসীরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে। পরে একসময়ে তারা শত্রুদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। এরপরে মিশরের কয়েকজন রাজা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। নতুন রাজ্য জয় করবার জন্য তাঁরা পশ্চিম এশিয়ায় অভিযান পাঠান। এইসব রাজাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন তৃতীয় থাটমোস। তিনি পশ্চিম

এশিয়ার অনেকগুলি শহর জয় করেন। তাছাড়া ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি দ্বীপগুলি জয় করবার জন্যও তিনি যুদ্ধ-জাহাজ পাঠিয়েছিলেন।

প্রাচীন মিশরবাসীরা বহু দেবদেবীর পূজা করত। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সূর্যদেবতা "রে", থিব্‌স নগরের দেবতা "আমন" এবং নীল নদ ও পরলোকের দেবতা "ওজাইরিস্"। দেবতাদের মধ্যে অনেকে বিড়াল, ভেড়া, কুমির প্রভৃতি জন্তুর মূর্তিতে পূজা পেতেন। কারণ মিশর-বাসীরা মনে করত যে দেবতারা এইসব মূর্তি ধরে মানুষকে দেখা দেন।



কারনাকের মন্দির

"আমনের" উদ্দেশে মিশরীয়রা অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্দির তৈরী করেছিল। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সুন্দর মন্দিরটি "কারনাকের মন্দির" নামে পরিচিত। এই মন্দিরের স্তম্ভগুলির গড়ন এবং কারুকার্য দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

মিশরীয়রা মনে করত, মৃত্যুর পরও মানুষের আত্মা মৃতদেহের মধ্যেই বাস করে। তাই মৃতদেহকে রক্ষা করবার জন্য মিশরবাসীরা

প্রাণপণ চেষ্টা করত। মৃতদেহকে কিছুদিন নোনা জলে ডুবিয়ে রাখার পর তার গায়ে তারা নানারকম মশলা ও আঠা-মাখান কাপড়ের ফালি জড়িয়ে দিত। পরে কাঠের বাক্স করে সেটিকে কবর দেওয়া হত। এতে মৃতদেহ নষ্ট হতে পারত না। এইজন্য হাজার হাজার বছরের পুরানো মিশরীয়দের মৃতদেহ আজও আমরা দেখতে পাই। এই মৃতদেহগুলিকে বলা হয় "ম্যমি"।

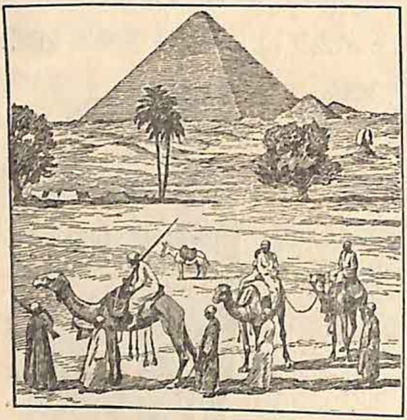


ম্যমি

আত্মার ব্যবহারের জন্য কবরের মধ্যে নানারকম খাবার-দাবার দেওয়া হত। যে সব জিনিস মৃত ব্যক্তি জীবিতকালে ব্যবহার করত, সেগুলিও রাখা হত। টুটেনখামেন নামে এক রাজার কবর থেকে অপূর্ব কারুকার্য-খচিত খাট-পালঙ্ক, চেয়ার, টেবিল, নানারকমের পাত্র, রাজপোশাক, সোনার গহনা প্রভৃতি বহু মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া গেছে।

মিশরের রাজাদের মধ্যে অনেকে তাঁদের মৃতদেহগুলি রক্ষা করবার জন্য নিজেরাই বড় বড় সমাধিগৃহ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এইগুলিই হল মিশরের বিখ্যাত পিরামিড। চারকোণা ভিতের উপর বড় বড় পাথর থাকে-থাকে গেঁথে এগুলি তৈরী করা হত। উপরের অংশ ক্রমে সরু করে গাঁথা হত। তাই যে কোন পাশ দিয়ে দেখলে এগুলিকে ত্রিভুজের মত দেখায়। এই পিরামিড-

গুলির মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড়, সেটি প্রায় পাঁচশ' ফুট উঁচু। একলক্ষেরও বেশী লোক কুড়ি বছর ধরে এটি নির্মাণ করেছিল।



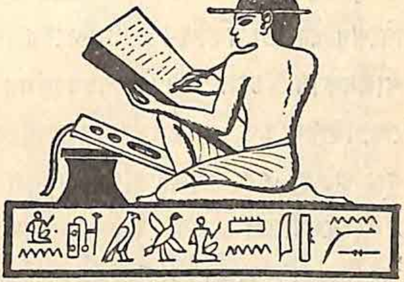
মিশরের পিরামিড

দেবমন্দির ও পিরামিডগুলির নির্মাণ-কৌশল দেখলে বোঝা যায় যে, গৃহ-নির্মাণ বিষয়ে সে যুগের মিশরবাসীরা কত উন্নতি করেছিল।

সেকালের মিশরবাসীরা আরও কয়েকটি শিল্পের জন্য খ্যাতিলাভ করেছিল। তারা হাতে সূতা কেটে খুব সূক্ষ্ম কাপড় তৈরী করতে পারত। কাঁচের জিনিসপত্র তৈরীর কৌশল তারাই প্রথম আবিষ্কার করে। রঙীন কাঁচের ব্যবহারও তারা জানত। মিশরীয়দের তৈরী নানারকমের পাত্র এবং চামড়ার জিনিস সেকালে অন্য দেশের লোকেরা আগ্রহ করে কিনত। অনেক শিল্পীকে রাজা ও পুরোহিতরা নিজেদের কাজে নিয়োগ করতেন।

প্রাচীন মিশরে লেখাপড়ারও বেশ আদর ছিল। লেখাপড়া শেখাবার ভার ছিল পুরোহিতদের উপর। এইজন্য মিশরের মন্দির-গুলিতে বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকত। নীল নদের তীরে নলখাগড়ার মত দেখতে এক রকমের উদ্ভিদ পাওয়া যায়। এর নাম "প্যাপিরাস"। মিশরীয়রা এগুলি একটার সঙ্গে আর একটা জুড়ে লম্বা কাগজের মত তৈরী করত এবং তার উপরে লিখত। ইংরাজি "পেপার" শব্দটি এই "প্যাপিরাস" কথাটি থেকে এসেছে।

মন্দির এবং পিরামিডের দেওয়ালেও মিশরীয়দের অনেক লেখা পাওয়া গেছে। অক্ষরের বদলে নানা রকম সাঙ্কেতিক ছবি দিয়ে লেখা বলে এই লেখাগুলিকে "চিত্রলিপি" বা "হাইরোগ্লিফিক" বলা হয়। অনেকদিন আগে একজন ফরাসী সৈন্য মিশরের রসেটা শহরে একখানি পাথর কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। এই পাথরে হু'রকম মিশরীয় লিপি ও একটি গ্রীক লিপি ছিল। অনেকদিন পরে সামপোলিয়ঁ নামে একজন ফরাসী পণ্ডিত গ্রাক লিপিটির সাহায্যে মিশরীয় লিপি পড়বার চেষ্টা করতে থাকেন। বহু বৎসরের সাধনার পর তিনি সে লিপি পড়বার সঙ্কেত আবিষ্কার করেন। তাঁর অসাধারণ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের জন্যই আজ আমরা প্রাচীন মিশরের ইতিহাস জানতে পেরেছি।



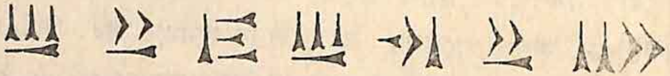
হাইরোগ্লিফিকের চিত্র

মেসোপটেমিয়া—নীল নদের শ্যামল উপত্যকা ছেড়ে আমরা যদি পূবদিকে এগিয়ে যাই তাহলে সাহারার মত একটি মরুভূমি দেখতে পাব। এটি হ'ল আরব দেশের মরুভূমি। মরুভূমি পার হয়ে যদি আরও এগিয়ে চলি তাহলে তুটি বড় নদী আমাদের চোখে পড়বে। এদের একটির নাম ইউফ্রেটিস, অন্যটির নাম টাইগ্রিস। তুটি বোনের মত এরা পাশাপাশি বয়ে গিয়ে পারস্য উপসাগরে পড়েছে। পুরাকালে গ্রীকেরা এই নদী-ঘেরা দেশটির নাম দিয়েছিল "মেসোপটেমিয়া" অর্থাৎ তুই নদীর দেশ।

অতি প্রাচীন কালে মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণে সুমেরীয় নামে

একটি জাতি বাস করত। তখন এখানে অনেক জলাজমি ও বড় বড় বিল ছিল। সুমেরীয়রা নদী থেকে খাল কেটে ও বাঁধ বেঁধে জায়গাটিকে বাসের যোগ্য করেছিল। মিশরীয়দের মত তারাও ছোট ছোট শহরে বাস করত। এই শহরগুলির প্রত্যেকটি ছিল স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। মিশরের মত এখানেও প্রত্যেক শহরের একজন করে বিশেষ দেবতা ছিলেন। মন্দিরের পুরোহিতরা এই সব শহরগুলির শাসনকার্য চালাতেন। শহরগুলির পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। এখানকার লোকেরা বর্শা, কুড়াল ইত্যাদি নিয়ে যুদ্ধ করত, এবং আত্মরক্ষার জন্য ঢাল ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করত।

সুমেরীয়রা এক নতুন ধরনের লেখার কায়দা আবিষ্কার করেছিল। কাদা দিয়ে তৈরী নরম টালির উপর এরা খাগের



কিউনিফর্ম লিপি

কলম বা কাঠি দিয়ে লিখত। টালিগুলিকে পরে রোদে শুকিয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে নেওয়া হত। এদের লেখাগুলি খোঁচা খোঁচা তীরের ফলার মত দেখায়। তাই সুমেরীয় লিপিকে "কিউনিফর্ম" বা কীলকাকৃতি লিপি বলা হয়।

সুমেরীয়রা চাষবাস ও শিল্পের কাজ করে জীবন ধারণ করত। এখানে এত প্রচুর শস্য জন্মাত যে সুমেরীয়রা তা বিদেশে রপ্তানি করে তার বদলে নানা জিনিসপত্র নিজেদের দেশে আনত। এদের তৈরী পশমের কাপড়েরও খুব খ্যাতি ছিল।

অনেককাল পরে অন্য এক জাতি এসে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া

4867 1793

জয় করে। এদের রাজধানী ব্যাবিলনের নামে রাজ্যেরও নাম হয় ব্যাবিলন। এই নতুন জাতির লোকেরা সুমেরীয়দের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এদের রাজত্বকালে এখানকার সভ্যতার আরও উন্নতি হয়। এই উন্নততর সভ্যতাকে "ব্যাবিলনের সভ্যতা" বলা হয়ে থাকে। ব্যাবিলনের অধিবাসীরা গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছিল। জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে তারাই প্রথম চর্চা করতে শুরু করে।



সূর্য-দেবতার সম্মুখে রাজা হামুরাবি

ব্যাবিলনের রাজাদের মধ্যে খুব নাম-করা রাজা ছিলেন হামুরাবি। ইনি সমস্ত মেসোপটেমিয়ার উপর রাজত্ব করতেন। আশেপাশের আরও কয়েকটি রাজ্য তিনি জয় করেছিলেন। বিচারের সুবিধার জন্য হামুরাবি কতকগুলি আইন প্রণয়ন করেন। তাঁর আদেশে যে পাথরখানিতে এই আইনগুলি খোদাই করা হয়েছিল সেই পাথরখানি পাওয়া গেছে। পৃথিবীর প্রথম আইন-প্রণেতা হিসাবে হামুরাবি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

ব্যাবিলনের আর একজন বড় রাজা ছিলেন দ্বিতীয় নেবুকাডনেজার। তাঁর সময়ে শোভা ও সমৃদ্ধির জন্য ব্যাবিলন সেকালের সেরা শহর হয়ে উঠেছিল। রাজা এই শহরটিকে নতুন করে নির্মাণ করেন। পরিখা আর প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই শহরটির মাঝখান

S.C.E.R.T. LIBRARY
Date 28.8.95
9175

দিয়ে ইউফ্রেটিস নদী বয়ে যেত। এপার থেকে ওপারে যাবার জন্য নদীর উপর একটি কাঠের সেতু ছিল। শহরের প্রকাণ্ড প্রবেশদ্বার-গুলি ছিল পিতলের তৈরী ; আর রাস্তাগুলি ছিল সোজা সোজা আর খুব চওড়া। রাস্তার দুধারে ছিল ইটের বড় বড় বাড়ী। নগর-দেবতা মারডুকের থাকে-থাকে গাঁথা সুন্দর মন্দিরটি ছিল শহরের মাঝখানে। এর থেকে অল্প কিছু দূরে ছিল নেবুকাডনেজারের বিশাল রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে খুব সুন্দর সুন্দর রং-বেরংয়ের মূর্তি ও দৃশ্য আঁকা ছিল। প্রায় দু' লাখ লোক তখন ব্যাবিলনে বসবাস করত।

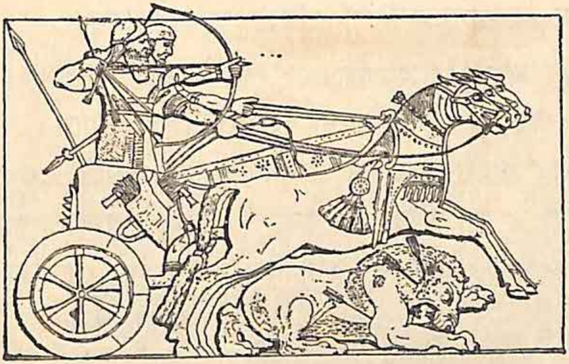
রাজপ্রাসাদের এক কোণে রাজা একটি অপূর্ব উদ্যান নির্মাণ করিয়েছিলেন। রাজপ্রাসাদের সমান উঁচু, থাকে থাকে থামের উপর গাঁথা কতকগুলি চাতালের উপর এই উদ্যানটি নির্মিত হয়েছিল। এখানে নানারকম ছোট-বড় ফুল ও ফলের গাছ এবং সুন্দর সুন্দর তালপাতা ছিল। শোনা যায় যে, নেবুকাডনেজার তাঁর পারস্য-দেশীয় রাণীকে খুশী করবার জন্য এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। ইতিহাসে এটি "ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান" নামে বিখ্যাত।

ব্যাবিলনীয়দের প্রতিবেশী ছিল আসিরীয়রা। তারা ব্যাবিলন রাজ্যের উত্তরে বাস করত। এদের রাজধানীর নাম ছিল নিনেভে। তখনকার দিনে এটিও একটি বিখ্যাত শহর ছিল। আসিরীয়রা অনেক বিষয়ে ব্যাবিলনীয়দের অনুকরণ করত। এরা তাদের মতই লম্বা লম্বা দাড়ি ও চুল রাখত এবং পা পর্যন্ত ঝোলান আলখাল্লা পরত।

নিপুণ যোদ্ধা হিসাবে আসিরীয়রা সেযুগে খুব নাম করেছিল। মিশর ও ব্যাবিলন জয় করে এক সময়ে তারা মস্ত বড় এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। আসিরীয়রা ঘোড়ায় আর রথে চড়ে যুদ্ধ করত। এদের প্রধান অস্ত্র ছিল বর্শা আর ধনুক। শত্রুর আক্রমণ

থেকে রক্ষা পাবার জন্য সেকালের অনেক শহর প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকত। আসিরীয়রাই সর্বপ্রথমে এই প্রাচীর ভাঙ্গার কৌশল আবিষ্কার করে। বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়ে বার বার আঘাত করে তারা প্রাচীরগুলি ভেঙে ফেলত।

আসিরীয় রাজারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। যুদ্ধের সময়ে যারা তাঁদের বাধা দিত, তাদের শহরগুলি তাঁরা একেবারে ধূলিসাৎ করে দিতেন। যুদ্ধে পরাজিত অধিকাংশ লোককে মেরে ফেলা হত।



আসিরীয় যোদ্ধা

অনেক সময়ে বন্দীদের হাত পা কেটে ফেলা হত। অনেককে তাঁরা পুড়িয়ে বা জীবিত অবস্থায় গায়ের চামড়া তুলে হত্যা করতেন।

আসিরীয় রাজাদের মধ্যে আসুরবানিপাল একটু অন্যরকমের মানুষ ছিলেন। তিনি শুধু যুদ্ধই করতেন না, লেখাপড়ার চর্চাও করতেন। তাঁর একটি মস্ত বড় গ্রন্থাগার ছিল। রাজা গ্রন্থাগারের জন্য মাটির টালির উপর লেখা অনেক পুঁথিপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। এর মধ্যে প্রায় বিশ হাজার মাটির টালি নিনেভে শহরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেছে।

সিন্ধু-তীরের সভ্যতা—সেযুগে মিশর ও মেসোপটেমিয়ার

মত ভারতবর্ষের সিন্ধু নদের তীরেও একটি উন্নত ধরনের সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। সে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা। সিন্ধু প্রদেশের মোহেঞ্জোদরো এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের হরপ্পায় এই সভ্যতার নিদর্শনগুলি পাওয়া গেছে। এখন এই দুটি জায়গাই পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে। ভারতের এই প্রাচীনতম সভ্যতার অস্তিত্ব সর্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক বাঙালী ঐতিহাসিক। তারপর স্যার জন মার্শাল নামে একজন ইংরাজ পণ্ডিত মাটি খুঁড়ে এই সভ্যতার নিদর্শনগুলিকে প্রকাশ করেন।

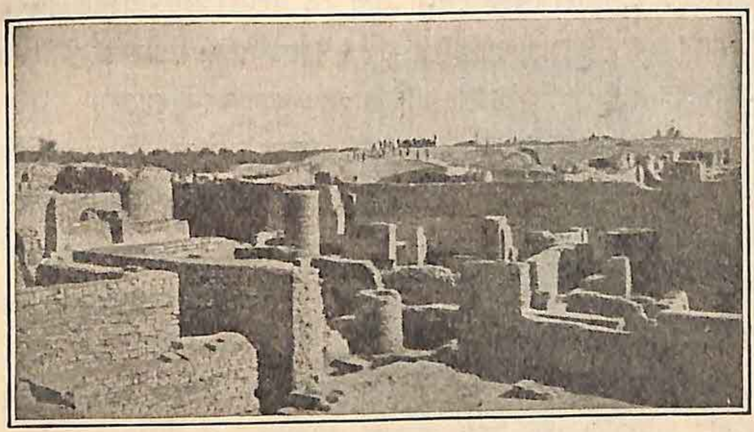
হরপ্পা এবং মোহেঞ্জোদরোতে অনেকগুলি শীলমোহর পাওয়া গেছে। এগুলির উপর অনেক কিছুই লেখা আছে। কিন্তু সে লেখা আজ পর্যন্ত কেউ পড়তে পারেন নি। তাই সে যুগে সিন্ধু নদের তীরে কারা রাজত্ব করতেন তা আমরা জানতে পারি নি। তবে এদের ঘর-বাড়ী এবং জিনিসপত্র যা পাওয়া গেছে তা থেকে এদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়।



মোহেঞ্জোদরোর শীলমোহর

মিশর ও মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীদের মত সে যুগের সিন্ধুতীরের অধিবাসীরাও শহরে বাস করত। এদের শহরগুলির শাসনব্যবস্থা খুব ভাল ছিল। এখানকার মতই জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি এদের খুব দৃষ্টি ছিল। রাস্তাগুলি ছিল

সোজা এবং বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সেগুলি পরিষ্কার রাখবার জন্য পাশে পাশে আবর্জনা ফেলবার পাত্র রাখা হত। জল-নিকাশের জন্য ঢাকা দেওয়া পাকা নর্দমা ছিল। এরা কাদামাটির ইট পুড়িয়ে বাড়ী তৈরী করত। এর মধ্যে কতকগুলি ছিল দোতলা বা তেতলা। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই স্নানের ঘর, পায়খানা ও জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত ছিল। মোহেঞ্জোদরোতে একটি খুব বড় স্নানাগার ছিল। সম্ভবতঃ জলের মধ্যে খেলাধুলা ও স্নান করবারজন্য বহু লোক সেখানে জমা হত।



মোহেঞ্জোদরোর ধ্বংসাবশেষ

এখানকার লোকেরা তুলা ও পশমের তৈরী পোশাক পরত এবং স্ত্রীপুরুষ সকলেই গহনা পরতে ভালবাসত। তারা লোহার ব্যবহার জানত না। অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি সব তৈরী হত তামা এবং ব্রোঞ্জ দিয়ে। তীর, ধনুক, বর্শা, কুড়াল প্রভৃতি ছিল এদের প্রধান অস্ত্র।

সিন্ধুতীরের অধিবাসীদের উপজীবিকা ছিল কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য। এখানকার উর্বর জমিতে যব, গম ও তুলার

চাষ খুব ভাল হত। তুলার আঁশ থেকে কাপড় তৈরী করবার পদ্ধতি এরাই প্রথম আবিষ্কার করে। শিল্পীরা নানারকম বাসন-কোসন, অলঙ্কার, আসবাব-পত্র তৈরী করত। আগুনে পুড়িয়ে ইঁট তৈরী করতে এরা খুব দক্ষতা অর্জন করেছিল। মাটির পাত্র তৈরী করে সেগুলিকে এরা চকচকে করে পালিশ করত আর তুলি দিয়ে সেগুলির উপর নানা রকমের চিত্র এঁকে দিত। এইসব পাত্র তৈরী করবার জন্য এরা এখনকার মত কুমোরের চাকা ব্যবহার করত। শীলমোহরগুলির উপর যে সব জীবজন্তুর ছবি দেখা যায়, তা থেকে বোঝা যায় যে এদের মধ্যে অনেক নিপুণ চিত্রকর ছিল। এরা সুন্দর সুন্দর মূর্তিও গড়তে পারত। মেসোপটেমিয়ার লোকদের সঙ্গে এদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত বলে জানা গেছে।

এখানকার অধিবাসীদের ধর্মকর্ম সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। কারণ মাটি খুঁড়ে এখানে কোন দেবমন্দির পাওয়া যায়নি। তবে কতকগুলি মূর্তি দেখে মনে হয় যে এরা শিব ও জগন্মাতার পূজা করত। প্রাচীন হিন্দুরা সম্ভবতঃ এদের কাছ থেকে এই দেবদেবীর পূজা করতে শিখেছিলেন।

চীন—চীনের সভ্যতাও অতি প্রাচীন। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে থেকে চীনের ইতিহাস জানা যায়। কিন্তু চীনারা তারও অনেক কাল আগে বেশ সভ্য হয়ে উঠেছিল। চীন দেশে দুটি বড় বড় নদী আছে। এদের নাম হোয়াং হো এবং ইয়াং সি-কিয়াং। এই নদী দুটির তীরেই চীনারা আগে বাস করত। তারপর ধীরে ধীরে তারা অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

চীনাদের উপকথাতে আছে যে, তাদের দেশের প্রথম মানুষ ছিলেন "পান কু"। তিনি নাকি আঠারো হাজার বছর বেঁচেছিলেন, এবং আকাশ ও পৃথিবীকে রূপ দিয়েছিলেন। হোয়াং হো ও ইয়াং সি-

কিয়াংএর সৃষ্টি হয়েছিল নাকি তাঁর চোখের জল থেকে। তিনি নিঃশ্বাস ফেললে বাতাস বইত, তাকালে বিদ্যুৎ চমকাত, আর কথা বললে বজ্রের নির্ঘোষ শোনা যেত। পান কুর মৃত্যুর পর নাকি তাঁর হাড়, রক্ত, মাংস, চুল ও লোম থেকে চীনের বড় বড় পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী ও গাছপালার সৃষ্টি হয়েছিল।

উপকথাগুলি থেকে অতি প্রাচীন পাঁচজন রাজার কথাও আমরা জানতে পারি। চীন সভ্যতার গোড়াপত্তন নাকি তাঁদের সময়েই হয়েছিল। কেমন করে মাছ ধরতে হয়, কি দিয়ে রেশম তৈরী করতে হয়, কি করে লিখতে হয়—এই সব বিদ্যা তাঁরা প্রজাদের শিখিয়েছিলেন। চীনা সঙ্গীত এবং চিত্রকলার সৃষ্টিও নাকি তাঁরাই করেছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন চুম্বক পাথর আবিষ্কার করেছিলেন এবং ইঁট দিয়ে বাড়ী তৈরী করতে শিখিয়েছিলেন। গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে জানবার জন্য তিনি নাকি একটি মানমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। আর একজন রাজা বনজঙ্গল কেটে এবং হোয়াং নদীর বন্যার জল রোধ করে চাষবাসের সুবিধা করে দিয়েছিলেন।



চাউ যুগের ব্রোঞ্জের উপর কারুকার্য

এর অনেক কাল পরে "সাঙ" বা "ইন" বংশের রাজারা

শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। হোয়াং নদীর তীরে এক জায়গায় কতকগুলি বড় বড় মাটির স্তূপ ছিল। এগুলিকে বলা হত "ইনের স্তূপ"। সেই স্তূপগুলি খুঁড়ে "সাঙ্" রাজাদের রাজধানী আবিষ্কার করা হয়েছে। সাঙ্ যুগের দৈবজ্ঞরা কচ্ছপের খোলার সাহায্যে লোকের ভাগ্য গণনা করত। জেলেরা কচ্ছপ ধরে দেশের সরকারের কাছে বিক্রী করত, আর সেগুলির বুকের খোলা পরিষ্কার ও পালিশ করে রেখে দেওয়া হত। কেউ কোন কিছু জানতে চাইলে দৈবজ্ঞরা এগুলির উপর আগুনে পোড়ান তপ্ত লোহার শলা বিঁধিয়ে দিতেন। এর ফলে যে সব দাগ ও আঁচড় পড়ত তা দেখে তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। পরে খোলাগুলির উপর প্রশ্ন ও উত্তর লিখে মাটির নীচে রেখে দেওয়া হত। ইনের স্তূপ খুঁড়ে এ রকম অনেক খোলা পাওয়া গেছে।

এই সব কচ্ছপের খোলার উপর লেখা থেকে জানা যায় যে, সে সময়ে চীনের লোকেরা শিকার করে, মাছ ধরে এবং চাষ আবাদ করে জীবন ধারণ করত। তারা মাটি এবং ব্রোঞ্জ দিয়ে অনেকরকম সুন্দর সুন্দর বাসন-পত্রও তৈরী করত। এর অনেকগুলির ওপর নানারকম চিত্র ও মীনে-করা কাজ দেখা যায়।

প্রাচীন যুগের অন্য জাতির লোকদের মত চীনারাও নানা দেবদেবীর পূজা করত। মৃত পূর্বপুরুষদেরও এরা দেবতা বলে মনে করত।

সাঙ্ বংশের পর চাউ বংশ রাজত্ব করে। এই বংশের রাজা "উ" দেশের গণ্যমান্য লোকদের পাঁচ ভাগে ভাগ করেন। তিনি এঁদের প্রত্যেককে খানিকটা করে জমিজমা দেন। এই সকল জমির প্রজারা জমিদারের শাসন মেনে চলত এবং তাঁর ব্যবহারের জন্য মাছ, মাংস, কাঠ, চামড়ার পোশাক প্রভৃতি যোগাত। কুড়ি বছর বয়স হলে প্রত্যেক প্রজা চাষের জন্য এক ফালি জমি পেত। ষাট বছর

বয়স পর্যন্ত তারা সেই জমি চাষ করত। এর পরেও যদি কেউ বেঁচে থাকত তবে তার ভরণ-পোষণের জন্য তাকে বৃত্তি দেওয়া হত।

চাউ রাজারা অনেকদিন পর্যন্ত জমিদারদের কঠোর শাসনে রেখেছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককে রাজসভায় এসে নিজেদের জমিদারীর চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাব দাখিল করতে হত। রাজারা নিজেরাও পাঁচ বছর অন্তর সমস্ত রাজ্য ঘুরে দেখতেন। যাঁরা ভালভাবে জমিদারী চালাতেন, তাঁরা রাজার কাছ থেকে প্রশংসা ও পুরস্কার পেতেন ; দুষ্ট এবং অসাধু জমিদারদের রাজা কঠোর শাস্তি দিতেন।

চাউ রাজাদের রাজত্বকালে চীন দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী কনফুসিয়াস জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর লেখা চীনদেশের একখানি ইতিহাস আছে। সেখানি পড়ে তখনকার অনেক বিষয় জানা যায়।

প্রশ্ন

১। প্রাচীনকালের মানুষেরা নদীর ধারে বাস করত কেন? কোন্ কোন্ নদীর ধারে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল?

২। প্রথম বর্ণমালার সৃষ্টি কি ভাবে হয়েছিল?

৩। মিশরকে "নীল নদের দান" বলা হয় কেন?

৪। হিক্সোজ ও তৃতীয় থাটমোস সম্বন্ধে কি জান?

৫। মিশরীয়দের কয়েকজন দেব-দেবীর নাম কর।

৬। ম্যমি ও পিরামিড সম্বন্ধে যা জান বল।

৭। মিশরের চিত্রলিপি কি করে পড়া সম্ভব হয়েছিল?

৮। সুমেরীয়রা কোথায় বাস করত? তাদের জীবন-যাপন প্রণালী বর্ণনা কর। 'কিউনিফর্ম' কাকে বলে?

৯। ব্যাবিলনের দু'জন বিখ্যাত রাজার নাম কর ও তাদের সম্বন্ধে যা জান বল।

১০। আসিরীয়রা কোথায় বাস করত? তাদের যুদ্ধ-প্রণালীর বর্ণনা দাও।

১১। সিন্ধুতীরের প্রাচীন সভ্যতার বিবরণ আমরা কি ভাবে জানতে পেরেছি? এই সভ্যতার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

১২। চীন দেশের উপকথা থেকে কি জানা যায়? চীনের দুটি বিখ্যাত প্রাচীন রাজবংশের নাম বল। তাদের সময়ে দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল?

মিশর	মেসোপটেমিয়া	ভারতবর্ষ	চীন
	৪৪০০ প্রাচীনতম শহর		
৩৪০০ প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা	৪০০০-৩০০০ সুমেরীয় সভ্যতার যুগ		
২৯০০-২৭৫০ পিরামিডের যুগ	২০৯০ হামুরাবি	২৭৫০-২৫০০ সিন্ধু তীরের সভ্যতার যুগ	২৭০০-২২৫০ প্রাচীনতম সম্রাটদের যুগ
১৭৮০-১৫৫০ হিক্‌সোজ্ প্রাধান্য			১৭৬৬-১১২২ সাঙ্ বা ইন বংশের রাজত্বকাল
১৪৭৯ তৃতীয় থাটমোস কর্তৃক পশ্চিম এশিয়ায় রাজ্যবিস্তার			১১২২-২৫০ চাউ বংশের রাজত্বকাল
৬৭২ আসিরীয়দের মিশর বিজয়	৬৬৯-৬২৬ আসুরবানিপাল		
	৬১২ নিনেভে শহর ধ্বংস ও আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতন		
	৬১২ নেবুকাডনেজার		
৫২৫ পারসিকদের মিশর বিজয়	৫৩৯ পারসিকদের ব্যাবিলন বিজয়		

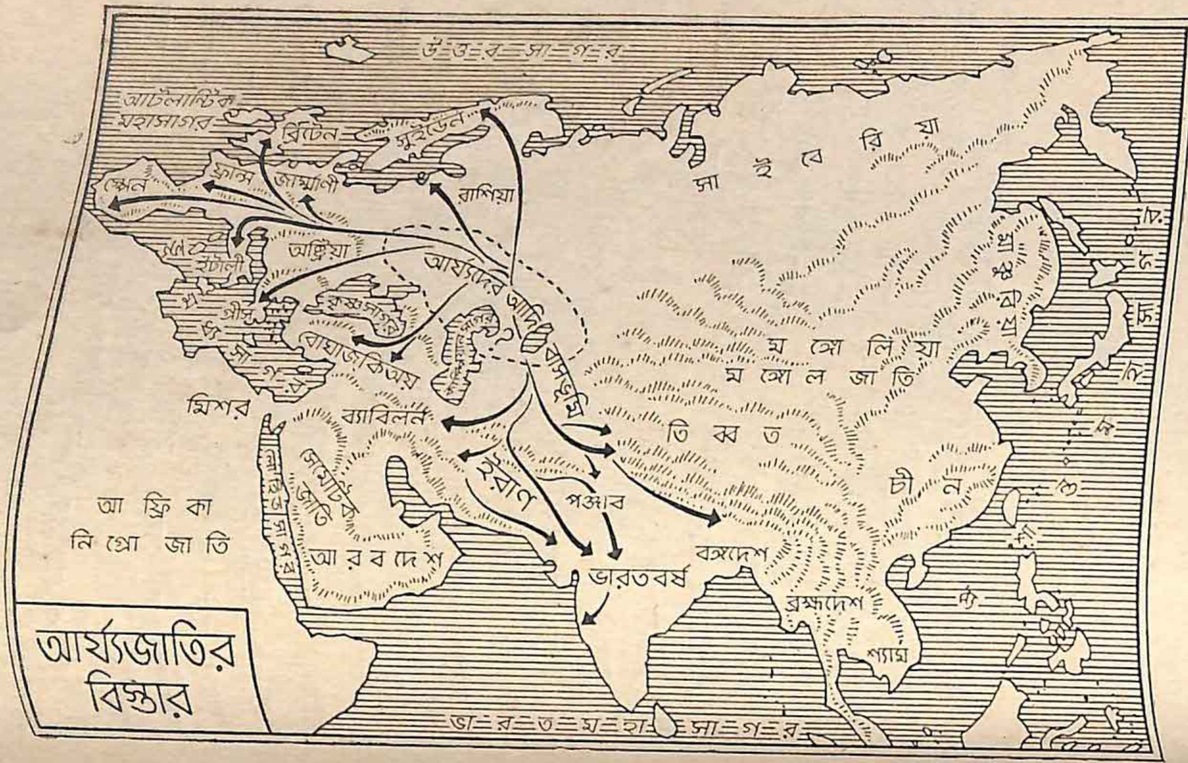
চতুর্থ অধ্যায়

আর্যদের কথা

বৈদিক ভারত—যাদের কথা এতক্ষণ তোমাদের বললাম তাদের চেয়েও সভ্যতায় উন্নতি করেছিল আর্যরা। আর্য বলতে কিন্তু বিশেষ একটি জাতিকে বোঝায় না। প্রাচীন কালে একটি ভাষা প্রচলিত ছিল; পণ্ডিতেরা সেই ভাষাটির নাম দিয়েছেন আর্য-ভাষা। এই ভাষায় যারা কথা বলত তাদের সকলকেই আর্য বলা হয়। এই প্রাচীন ভাষাটি থেকে ক্রমে সংস্কৃত, ইরানী, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। এইজন্য এই সব ভাষার মধ্যে বেশ মিল দেখা যায়।

আর্যরা প্রথমে কোথায় ছিল, তা কেউ ঠিক করে বলতে পারেন না। সম্ভবতঃ তারা প্রথমে মধ্য এশিয়া অথবা পূর্ব বা মধ্য ইউরোপের কোথাও বাস করত। তারপর ক্রমে তারা ইউরোপের গ্রীস, ইটালী প্রভৃতি দেশে এবং পারস্য ও ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে আর্যদের এক শাখা ভারতে আসে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের অধিবাসীদের পরাজিত করে তারা সেখানে বসবাস করতে আরম্ভ করে। এদেশে এসে আর্য ঋষিরা এক অপূর্ব সাহিত্যের সৃষ্টি করেছিলেন। তার নাম হল 'বেদ'। বেদের চারটি ভাগ আছে—ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব। সর্বপ্রথমে রচিত হয় ঋগ্বেদ। আর্যরাও অন্যান্য প্রাচীন জাতির মত প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির পূজা করত। বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা ইন্দ্র, আকাশের দেবতা বরুণ, মিত্র (সূর্য) এবং অগ্নি ছিলেন


আর্য্যজাতির বিস্তার
উত্তর সাগর
আটলান্টিক মহাসাগর
ব্রিটেন
সুইডেন
স্পেন
ফ্রান্স
জার্ম্মাণী
রাশিয়া
অষ্ট্রিয়া
ইটালী
গ্রীস
কৃষ্ণসাগর
ভূমধ্যসাগর
আর্য্যদের আদি বাসভূমি
বোঘাজকিঅয়
মিশর
ব্যাবিলন
ইরাণ
পঞ্জাব
সেমেটিক জাতি
আরব দেশ
লোহিত সাগর
আফ্রিকা
নিগ্রো জাতি
ভারতবর্ষ
বঙ্গদেশ
ব্রহ্মদেশ
শ্যাম
ভারত মহাসাগর
সাইবেরিয়া
মঙ্গোলিয়া
মঙ্গোল জাতি
তিব্বত
চীন
মাঞ্চুরিয়া

এঁদের প্রধান দেবতা। আর্য ঋষিরা দেবতাদের উদ্দেশে যে সব ছন্দোবদ্ধ স্তব-স্তুতি রচনা করেছিলেন, সেগুলি এই ঋগ্বেদে আছে।

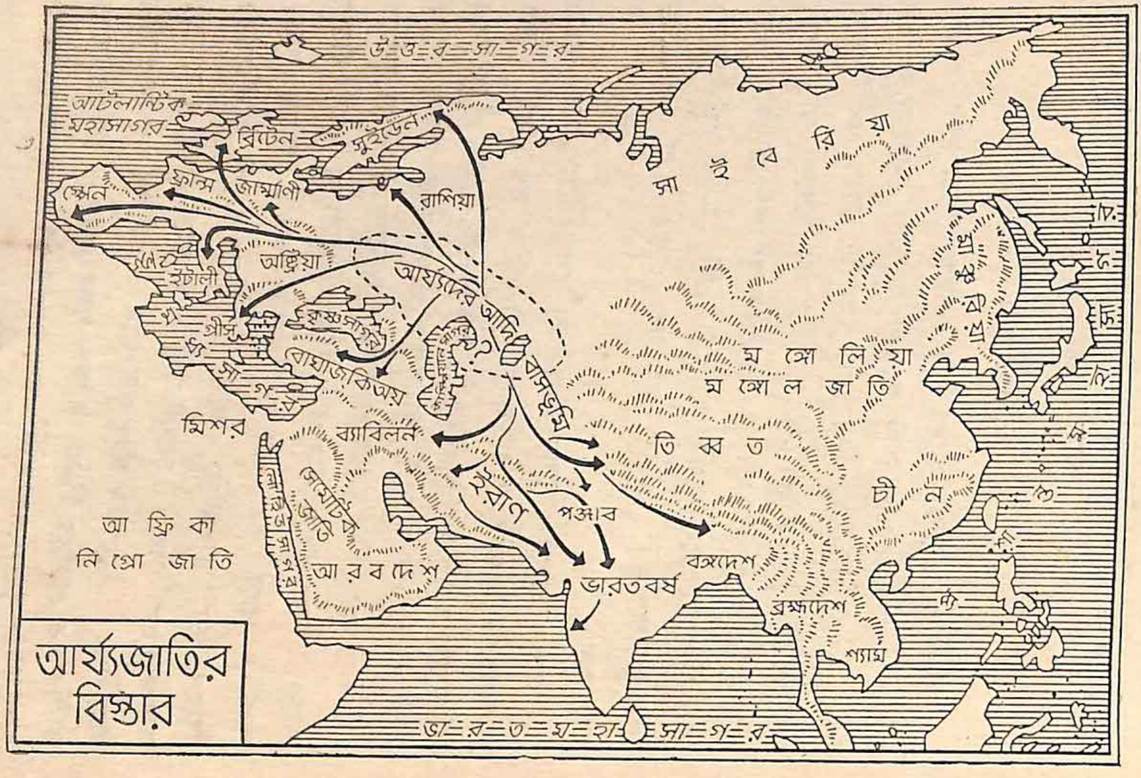
প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ দেখে আর্য ঋষিরা উচ্ছ্বসিত হয়ে অতি সুন্দর সুন্দর স্তব-স্তুতি রচনা করতেন। অন্ধকার রাত্রির শেষে সূর্য-কিরণে জড়ান উষাকে তাই তাঁরা বন্দনা করলেন—

"আকাশ-দুহিতা সুন্দরী উষা শোভিছে কিবা
যুবতী শুক্লবসনা কান্তা স্বর্ণবিভা,
বিশ্বধারিণী পার্থিব সব ধনেশ্বরী
সুভগা শোভনা হে উষা দাঁড়াও নয়ন ভরি।"

ঋগ্বেদে এই রকম সুন্দর স্তব আরও অনেক আছে। তোমরা বড় হয়ে সেগুলি পড়লে নিশ্চয়ই আনন্দ পাবে।

আর্যদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। দেবদেবীর উদ্দেশে তারা যজ্ঞ করত। সে সময়ে আর্য ঋষিরা আগুন জ্বেলে তাতে দেবতাদের উদ্দেশে ঘি, মাংস, সোমলতার রস আহূতি দিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বেদের মন্ত্র আবৃত্তি করতেন।

দেবতাদের কথা চিন্তা করতে করতে আর্য ঋষিরা ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুতেই একই ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁদের লেখা উপনিষদ্ নামে গ্রন্থগুলিতে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে। আর্য ঋষিরা সবরকম ভোগবিলাস ত্যাগ করে পরমেশ্বরকে জানবার চেষ্টা করতেন। যাজ্ঞবল্ক্য নামে সে যুগে একজন ঋষি ছিলেন। তাঁর দুই স্ত্রী ছিলেন, একজনের নাম মৈত্রেয়ী, আর একজনের নাম কাত্যায়নী। বৃদ্ধ বয়সে যাজ্ঞবল্ক্য সংসার ত্যাগ করবেন বলে স্থির করলেন। তখন তিনি তাঁর দুই স্ত্রীকে ডেকে বল্লেন, "আমি বনে


আর্য্যজাতির বিস্তার
উত্তর সাগর
আটলান্টিক মহাসাগর
ব্রিটেন
সুইডেন
ফ্রান্স
জার্ম্মাণী
স্পেন
রাশিয়া
অষ্ট্রিয়া
ইটালী
গ্রীস
কৃষ্ণসাগর
ভূমধ্যসাগর
আর্য্যদের আদি বাসভূমি
এশিয়া মাইনর
মিশর
ব্যাবিলন
সেমেটিক জাতি
লোহিত সাগর
আরবদেশ
ইরাণ
পঞ্জাব
ভারতবর্ষ
বঙ্গদেশ
ব্রহ্মদেশ
শ্যাম
তিব্বত
মঙ্গোলিয়া
মঙ্গোল জাতি
সাইবেরিয়া
মাঞ্চুরিয়া
চীন
আফ্রিকা
নিগ্রো জাতি
ভারত মহাসাগর

এঁদের প্রধান দেবতা। আর্য ঋষিরা দেবতাদের উদ্দেশে যে সব ছন্দোবদ্ধ স্তব-স্তুতি রচনা করেছিলেন, সেগুলি এই ঋগ্বেদে আছে।

প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ দেখে আর্য ঋষিরা উচ্ছ্বসিত হয়ে অতি সুন্দর সুন্দর স্তব-স্তুতি রচনা করতেন। অন্ধকার রাত্রির শেষে সূর্য-কিরণে জড়ান উষাকে তাই তাঁরা বন্দনা করলেন—

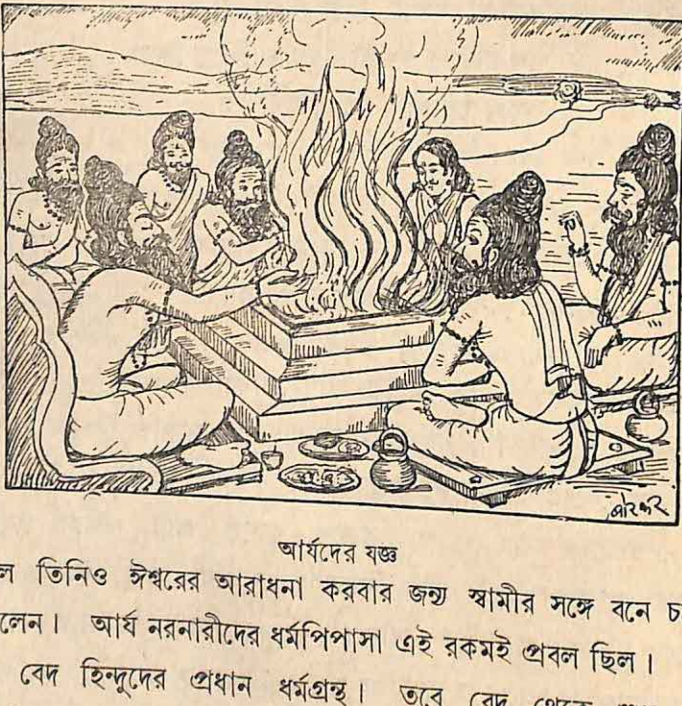
"আকাশ-দুহিতা সুন্দরী উষা শোভিছে কিবা
যুবতী শুক্লবসনা কান্তা স্বর্ণবিভা,
বিশ্বধারিণী পার্থিব সব ধনেশ্বরী
সুভগা শোভনা হে উষা দাঁড়াও নয়ন ভরি।"

ঋগ্বেদে এই রকম সুন্দর স্তব আরও অনেক আছে। তোমরা বড় হয়ে সেগুলি পড়লে নিশ্চয়ই আনন্দ পাবে।

আর্যদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। দেবদেবীর উদ্দেশে তারা যজ্ঞ করত। সে সময়ে আর্য ঋষিরা আগুন জ্বেলে তাতে দেবতাদের উদ্দেশে ঘি, মাংস, সোমলতার রস আহুতি দিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বেদের মন্ত্র আবৃত্তি করতেন।

দেবতাদের কথা চিন্তা করতে করতে আর্য ঋষিরা ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুতেই একই ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁদের লেখা উপনিষদ্ নামে গ্রন্থগুলিতে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে। আর্য ঋষিরা সবরকম ভোগবিলাস ত্যাগ করে পরমেশ্বরকে জানবার চেষ্টা করতেন। যাজ্ঞবল্ক্য নামে সে যুগে একজন ঋষি ছিলেন। তাঁর দুই স্ত্রী ছিলেন, একজনের নাম মৈত্রেয়ী, আর একজনের নাম কাত্যায়নী। বৃদ্ধ বয়সে যাজ্ঞবল্ক্য সংসার ত্যাগ করবেন বলে স্থির করলেন। তখন তিনি তাঁর দুই স্ত্রীকে ডেকে বল্লেন, "আমি বনে

যাবার আগে আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাদের ভাগ করে দিয়ে যাব।" কিন্তু মৈত্রেয়ী বললেন, "সম্পত্তির অধিকারিণী হলে আমি অমর হব ত?" যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—"না।" তখন মৈত্রেয়ী বললেন, "যা পেয়ে অমর হব না, তা নিয়ে আমি কি করব!"—এই

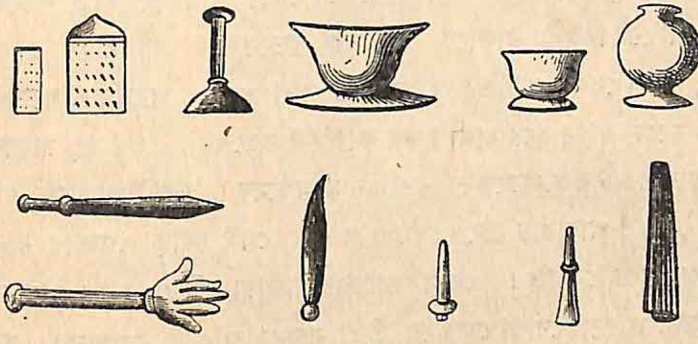


আর্যদের যজ্ঞ

বলে তিনিও ঈশ্বরের আরাধনা করবার জন্য স্বামীর সঙ্গে বনে চলে গেলেন। আর্য নরনারীদের ধর্মপিপাসা এই রকমই প্রবল ছিল।

বেদ হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। তবে বেদ থেকে শুধু যে আর্যদের ধর্মের কথাই জানা যায় তা নয়; আর্যদের জীবন-যাত্রার কথাও এই বেদ থেকেই আমরা জানতে পারি। আর্যরা এদেশে এসে কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করেছিল। প্রত্যেক রাজ্যের একজন রাজা থাকতেন। তিনি রাজ্য শাসন করতেন, কেউ অন্যায় করলে তার বিচার করতেন, আর যুদ্ধের সময়ে সৈন্য

পরিচালনা করতেন। 'সভা' ও 'সমিতি' নামে দুটি পরিষদের মতামত নিয়ে তাঁকে রাজ্য শাসন করতে হত। পুরোহিত ছিলেন রাজ্যের আর একজন প্রধান ব্যক্তি। তিনি রাজা ও প্রজার মঙ্গলের জন্য যাগযজ্ঞ করতেন এবং রাজাকে নানারকম উপদেশ দিতেন।



যজ্ঞে ব্যবহৃত জিনিসপত্র

আর্যরা জীবিকা নির্বাহের জন্য চাষবাস এবং পশুপালন করত। তারা তুলা, পশম ও চামড়ার তৈরী পোশাক-পরিচ্ছদ পরত। উৎসবের সময়ে তারা গহনা এবং ফুল দিয়ে নিজেদের দেহ সাজাত। তারা নানারকম শস্য ও দুধ থেকে খাবার তৈরী করে খেত ; মাংস খাওয়া হত বিশেষ বিশেষ সময়ে এবং সেই সময়ে তারা সোমরসও পান করত। আমোদপ্রমোদের জন্য আর্যরা মৃগয়ায় যেত, পাশা খেলত এবং নাচগান করত। এছাড়া এখনকার ঘোড়দৌড়ের মত এদের মধ্যে রথ চালনার প্রতিযোগিতা হত।

আদিবাসীদের পরাজিত করে আর্যরা ক্রমে সমগ্র উত্তর ভারতে রাজ্যবিস্তার করে। এই জন্য উত্তর ভারতের আর এক নাম আর্যাবর্ত। দক্ষিণ ভারতেও যে তারা গিয়েছিল তা রামায়ণের গল্প থেকে জানা যায়।

আর্যদের নিজেদের মধ্যেও প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। মাঝে মাঝে খুব বড় যুদ্ধও হত। এই রকম একটি বড় যুদ্ধের কথা আমরা জানতে পারি মহাভারতের কাহিনী থেকে। শক্তিশালী আর্য রাজারা অন্য রাজাদের পরাজিত করে রাজসূয় যজ্ঞ করতেন। এই যজ্ঞ দু'বছর ধরে চলত। যজ্ঞের শেষে রাজ-পুরোহিত মন্ত্রপূত জল দিয়ে বিজয়ী রাজাকে অভিষিক্ত করতেন। এই সময়ে কৃত্রিম যুদ্ধ, পাশা খেলা প্রভৃতির আয়োজনও করা হত। পরাজিত রাজারা এই যজ্ঞে একত্র হয়ে নানা রকম কাজকর্ম করতেন। বড় বড় রাজারা আরও একটি যজ্ঞ করতেন,—তার নাম অশ্বমেধ। একটি ঘোড়াকে এক দল সৈন্যের পাহারায় ছেড়ে দেওয়া হত। সেই ঘোড়া স্বেচ্ছায় নানা রাজ্যে ঘুরে বেড়াত। সে সব রাজ্যের রাজারা যদি ঘোড়াকে বাধা না দিতেন, তাহলে বোঝা যেত যে তাঁরা বশ্যতা স্বীকার করলেন। যদি কেউ বাধা দিতেন তাহলে যুদ্ধ বেধে যেত। এক বছর পরে নানা দেশ ঘুরিয়ে ঘোড়াটিকে ফিরিয়ে আনা হত। তখন সেই ঘোড়াকে কেটে তার মাংস দিয়ে যজ্ঞ করা হত। যজ্ঞের সময়ে একজন পুরোহিত গল্প বলতেন আর একজন চারণ কবি রাজার স্তুতিগান করতেন।

আর্যরা ক্রমে এ দেশের লোকেদের সঙ্গে মিশে যায়। তখন তাদের ধর্ম ও আচার-ব্যবহারের অনেক পরিবর্তন হয়।

প্রাচীন ইরান—আর্যদের অন্য এক শাখা ইরান দেশে বসতি স্থাপন করেছিল। ইরান পারস্য দেশের আর এক নাম। ইরান আর আর্য প্রায় একই কথা ; তাই এদেশে যে সব আর্যরা বাস করত তাদের বলা হয় ইরানী। এরা প্রথমে মূল আর্য ভাষাতে কথা বলত ; পরে এর কিছু পরিবর্তন হয়ে প্রাচীন ইরানী ভাষার সৃষ্টি হয়।

ভারতের আর্যদের মত ইরানীরাও প্রথমে অনেক দেবদেবীর

পূজা করত। কিন্তু পরে তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের অনেক পরিবর্তন হয়। জরথুস্ট্র নামে একজন মহাপুরুষ ইরানীদের মধ্যে এক নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। তিনি বলতেন, এই পৃথিবীতে ভাল ও মন্দ, সত্য ও মিথ্যা, আলো ও অন্ধকার এই বিপরীত শক্তিগুলির মধ্যে সর্বদাই দ্বন্দ্ব চলছে। আহুর মাজদা হলেন যা কিছু ভাল, যা কিছু সত্য, তার প্রভু। অন্য দিকে যা কিছু মন্দ, যা কিছু মিথ্যা, তার সৃষ্টি করে আহ্রিমন। তাই জরথুস্ট্র সকলকে সৎ জীবন যাপন করে আহুর মাজদার পূজা করতে বলতেন।

জরথুস্ট্রের উপদেশ ও তাঁর রচিত স্তব-স্তুতিগুলি "আবেস্তা" নামে একখানি গ্রন্থে সংগৃহীত আছে। আবেস্তা ইরানীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ।

ইরানীদের অনেক সময় অগ্নির উপাসক বলা হয়। কিন্তু সত্যিই তারা অগ্নিপূজা করে না ; আলোর দেবতা আহুর মাজদার প্রকাশ বলে অগ্নিকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। অতি প্রাচীন কাল থেকে ইরানীরা বেদী নির্মাণ করে তার উপর আগুন জ্বালিয়ে রাখত ; সে আগুন কখনো নেভান হত না। আজ পর্যন্তও নাকি সে আগুন নেভান হয়নি।

জরথুস্ট্র বলতেন, আগুন, জল, বাতাস ও মাটি—এ সবই অতি পবিত্র। এদের অপবিত্র করা কোন মতেই উচিত নয়। তাই জরথুস্ট্রের ধর্ম যারা মানে তারা মৃতদেহ আগুনে না পুড়িয়ে, জলে না ভাসিয়ে, মাটিতে কবর না দিয়ে, একটি খুব উঁচু জায়গায় রেখে দেয়। শকুন প্রভৃতি পাখীরা সেই মৃতদেহ খেয়ে ফেলে।

বোম্বাই রাজ্যে পার্শী নামে একটি সম্প্রদায় আছে। এরা প্রাচীন ইরানীদের বংশধর। আজও এরা এদের প্রাচীন ধর্মমত আর অনুষ্ঠানগুলি বজায় রেখেছে।

হোমারের যুগে গ্রীস—প্রাচীন গ্রীকরা আর্যদের আর এক

শাখা। ভারতবর্ষে আর্যদের রাজসভায় অনেক গায়ক এবং চারণ কবি থাকত। তারা বড় বড় বীরদের জয়গান করে কবিতা রচনা করত।



গ্রীক-কবি হোমার

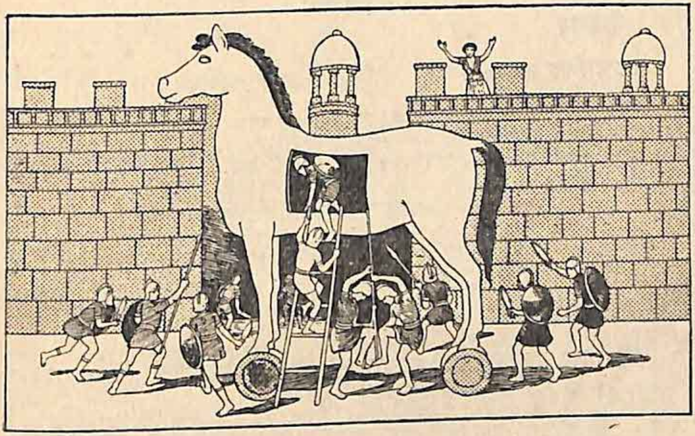
গ্রীকদের মধ্যেও এই রকম অনেক চারণ কবি ও গায়ক ছিল। হোমার নামে একজন অন্ধ গ্রীক চারণ কবি দুখানি মহাকাব্য রচনা করেন। একখানির নাম "ইলিয়াড", আর একখানির নাম "ওডিসি"।

সেকালে এশিয়া মাইনরের উপকূলে ট্রয় নামে একটি রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের সঙ্গে গ্রীকদের অনেকদিন ধরে যুদ্ধ চলেছিল। ইলিয়াডে সেই যুদ্ধের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিস গ্রীসদেশের স্পার্টা নগরে বেড়াতে আসেন। স্পার্টার রাজা ম্যানিলাসের স্ত্রী হেলেন ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। প্যারিস হেলেনকে হরণ করে দেশে নিয়ে যান। এ অপমান গ্রীকরা সহ্য করবে কেন?—তারা ট্রয় আক্রমণ করল। দশ বছর ধরে এই যুদ্ধ চলে। অবশেষে ইউলিসিস নামে এক গ্রীকবীরের কৌশলে ট্রয়-বাসীরা পরাস্ত হয়। একটি কাঠের ঘোড়ার মধ্যে গ্রীক সৈন্যরা লুকিয়ে থাকে। ট্রয়বাসীরা বুঝতে না পেরে ঘোড়াটিকে তাদের দুর্গের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। রাতের অন্ধকারে গ্রীক সৈন্যরা বেরিয়ে এসে দুর্গ দখল করে নেয়। তারপর গ্রীকরা ট্রয় রাজ্যটিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলে।

এরপরে গ্রীকরা দেশে ফিরে গেল। কিন্তু ইউলিসিস ফেরবার পথে ঝড়ের মুখে পড়লেন। তাঁর জাহাজ দলছাড়া হয়ে পথ হারিয়ে ফেলল। নানা দেশ ঘুরে এবং নানা বিপদ আপদ কাটিয়ে ইউলিসিস দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে নিজের দেশে ফিরে আসেন।

ইউলিসিসের এই অদ্ভুত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নিয়ে "ওডিসি" মহাকাব্য-খানি রচিত হয়েছে।

হোমারের মহাকাব্য দুখানি থেকে জানা যায় যে প্রাচীন গ্রীকরা প্রথমে গ্রামে বাস করত; পরে তারা শহর তৈরী করেছিল। এক একটি শহর ও তার আশেপাশের এলাকা নিয়ে এক একটি রাজ্য স্থাপিত হয়। এরা সব সময়েই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করত।



কাঠের ঘোড়ার ভিতরে লুক্কায়িত গ্রীক সৈন্য

সেকালের গ্রীক রাজারা ছিলেন একাধারে পুরোহিত, প্রধান বিচারক এবং সেনাপতি। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি সভা ছিল। রাজাদের এই সভার মত নিয়ে কাজ করতে হত। ক্রমে রাজার ক্ষমতা অনেক কমে যায়। ভারতের আর্যদের মত প্রাচীন গ্রীকদেরও প্রধান উপজীবিকা ছিল চাষবাস ও পশুপালন।

গ্রীস দেশের উত্তরে অলিম্পাস নামে এক বিশাল পর্বত আছে। গ্রীকদের বিশ্বাস ছিল যে, দেবতারা এই পর্বতের উপর বাস করেন।

গ্রীক দেবতাদের রাজা ছিলেন জিউস। গ্রীকরা জ্ঞানের দেবী অ্যাথিনী এবং সূর্য-দেবতা অ্যাপোলোকে খুব ভক্তি করত।

গ্রীকরা মনে করত যে, তারা একই পূর্বপুরুষের বংশধর। তাই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করলেও তাদের মধ্যে সামাজিক একতা গড়ে উঠেছিল।

কালক্রম

খ্রীষ্টপূর্ব

আনুমানিক ২৫০০—আর্য জাতির ভারতে আগমন।

" ১২০০-১০০০ ঋগ্বেদ রচনার কাল।

" ৯০০—হোমার।

" ৭০০-৬০০—জরথুস্ত্রের আবির্ভাব।

" ৬০০—প্রাচীনতম উপনিষদ্।

প্রশ্ন

১। আর্য বলতে কাদের বোঝায়? আর্যরা প্রথম কোথায় বাস করিত এবং পরে তারা কোন্ কোন্ দেশে ছড়িয়ে পড়ে?

২। বেদ কাকে বলে? বেদ থেকে আমরা আর্যদের বিষয়ে কি জানতে পারি? উপনিষদ্গুলি কেন লেখা হয়েছিল?

৩। রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ কি ভাবে করা হ'ত? এই যজ্ঞ কারা করতেন?

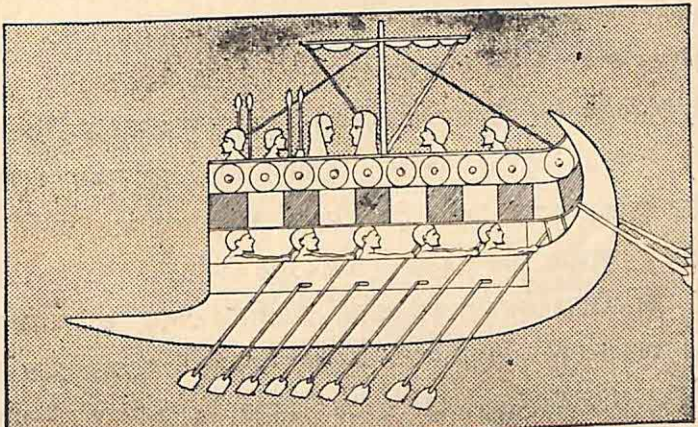
৪। জরথুস্ত্র কে ছিলেন? তিনি যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তার মূল কথাটি সংক্ষেপে বল। ইরানীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম কি? ইরানীরা কি ভাবে দেবতার উপাসনা করত?

৫। হোমার কে ছিলেন? তাঁর লিখিত প্রধান দু'খানি গ্রন্থের নাম কর। হোমারের মহাকাব্য পড়ে আমরা প্রাচীন গ্রীকদের সম্বন্ধে কি জানতে পারি?

পঞ্চম অধ্যায়

(১) ফিনিসিয়া দেশের বণিক

প্রাচীন কালে ভূমধ্য সাগরের পূর্ব উপকূলে ফিনিসিয়া নামে একটি ছোট দেশ ছিল। সেখানকার জমি ছিল কাঁকর আর পাথরে ভর্তি, তাই সেখানে কৃষিকার্যের কোন সুবিধা ছিল না। জীবিকা নির্বাহের জন্য ফিনিসীয়রা সাগর পাড়ি দিয়ে অন্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। ক্রমে এরা তখনকার দিনের সব চাইতে ভাল নাবিক ও পাকা ব্যবসাদার বলে খ্যাতি লাভ করেছিল।



ফিনিসীয় জাহাজ

ফিনিসীয়রা খুব বড় বড় জাহাজ তৈরী করত। এই জাহাজগুলো আবার ছিল একটু নতুন ধরণের। সেগুলির সামনের দিকটা ছিল সরু ও ছুঁচালো। এতে বাতাস আর জল কাটত খুব তাড়াতাড়ি। শুধু তাই নয়, এই সরু আগাটি দিয়ে দরকার

হলে শত্রুদের জাহাজগুলিকে ঢুঁ মেরে ভেঙে ফেলাও যেত। জাহাজগুলির দুদিকে দুসারি করে ওপর-নীচে চার সারি দাঁড় থাকত আর পাল খাটাবারও ব্যবস্থা ছিল। ফিনিসীয়দের অনেক ক্রীতদাস ছিল; তারাই দাঁড় বাইত।

তখনকার দিনে দিক নির্ণয় করবার কোন যন্ত্র ছিল না। সেজন্য রাত্রিতে জাহাজ চালান যেত না। ফিনিসীয়রাই প্রথম ধ্রুব নক্ষত্র দেখে দিক নির্ণয় করতে শেখে। তারপর তারা নানা অজানা দেশের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এমনি করে ক্রমে তারা জিব্রাল্টর প্রণালী পার হয়ে একদিন আটলান্টিক মহাসাগর আবিষ্কার করেছিল। শোনা যায় যে, এরা নাকি সমস্ত আফ্রিকা মহাদেশটিও ঘুরে এসেছিল। ক্রমে ভূমধ্য সাগরের অনেক জায়গায় এদের প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়।

ফিনিসীয়দের দুটি বড় শহর ছিল। একটির নাম সাইড্‌ন, অন্যটির নাম টাইর। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এরা ভূমধ্য সাগরের তীরে আরও কয়েকটি শহর নির্মাণ করেছিল। এর মধ্যে আফ্রিকার উত্তর উপকূলে কার্থেজ শহরটি ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত।

ফিনিসীয়রা সাধারণতঃ গ্রীস, ইটালী, স্পেন ও আফ্রিকার লোকদের সঙ্গে বাণিজ্য করত। কেউ কেউ ইংলণ্ডেও যেত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এরা কাঁচ, চীনামাটির জিনিসপত্র, কাপড় এবং একরকম রং তৈরী করত। এসব জিনিস ছাড়া এরা দেশ-বিদেশে গিয়ে নানা রকম শস্য, দামী পাথর, সোনা, রূপা, তামা, হাতীর দাঁতের তৈরী জিনিসপত্র কেনা-বেচা করত। ফিনিসীয়দের মধ্যে দাস-ব্যবসায় অর্থাৎ মানুষ কেনা-বেচা করার প্রথাও প্রচলিত ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য কি করে করতে হয় ফিনিসীয়রা তা বেশ ভালই জানত। এদের সাহসও ছিল দুর্জয়। কিন্তু এরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিল,

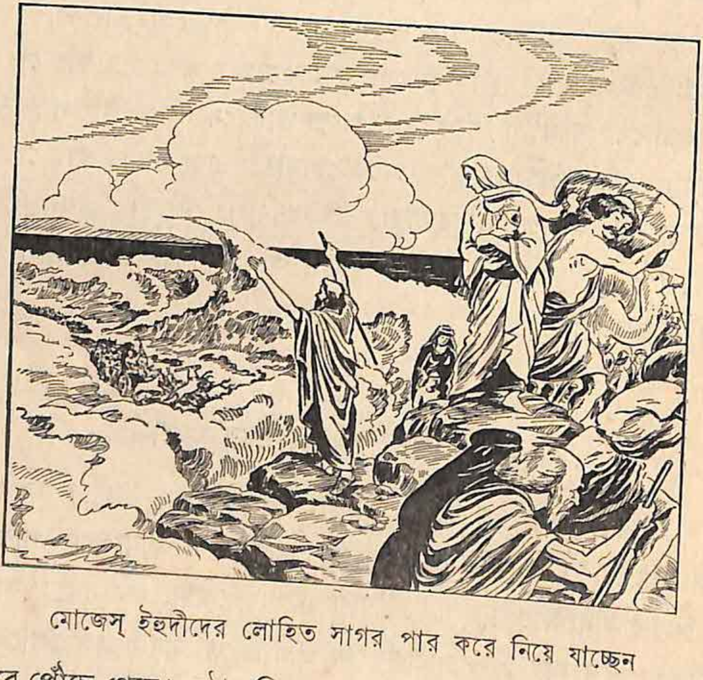
আর স্বার্থের জন্য এরা না পারত এমন কোন কাজ ছিল না। অন্যের জাহাজ আক্রমণ করে তাদের জিনিসপত্র লুঠ করতে এরা কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করত না। মধ্যযুগের পর্তুগীজেরাও এই রকম ছিল। তাই ফিনিসীয়দের আমরা "প্রাচীন যুগের পর্তুগীজ" বলতে পারি।

ইউরোপের অধিবাসীরা ফিনিসীয়দের কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী। মিশর এবং পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে ইউরোপবাসীদের পরিচয় এই ফিনিসীয়রাই করিয়ে দিয়েছিল। তাড়াতাড়ি লিখবার জন্য তারা এক সহজ ও সরল বর্ণমালার সৃষ্টি করেছিল। এদের কাছ থেকে গ্রীকরা সেই বর্ণমালা শিখে নেয়, অবশ্য তারা সেগুলির কিছু পরিবর্তন করে। ক্রমে গ্রীকদের কাছ থেকে রোমানরা এবং তাদের কাছ থেকে ইউরোপের অন্যান্য অধিবাসীরা এই বর্ণমালা শেখে। এখন সারা ইউরোপে যে বর্ণমালা প্রচলিত আছে তা এই ফিনিসীয় বর্ণমালারই পরিবর্তিত রূপ।

(২) ইহুদী ধর্মগুরুদের কথা

ফিনিসীয়দের প্রতিবেশী ছিল ইহুদীরা। তারা দক্ষিণ প্যালেষ্টাইনে বাস করত। ইহুদীরা প্রথমে ছিল যাযাবর। পশ্চিম এশিয়ার নানা জায়গায় তারা ঘুরে বেড়াত। কোন এক সময়ে তারা মিশর দেশে যায় এবং সেখানে সুখ ও শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। কিন্তু অনেক দিন পরে একজন ফেরো জোর করে ইহুদীদের দিয়ে রাস্তাঘাট, পিরামিড প্রভৃতি তৈরী করাতে শুরু করলেন। এই ফেরোর অত্যাচারে ইহুদীদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। এই সময়ে তাদের মধ্যে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। এঁর নাম মোজেস্।

মোজেস্ ফেরোর হাত থেকে ইহুদীদের বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অবশেষে একদিন ইহুদীদের নিয়ে তিনি মিশর ছেড়ে রওনা হলেন। কিন্তু ফেরো বড় সহজ লোক ছিলেন না। তিনি বার বার ইহুদীদের বাধা দিতে লাগলেন; শেষে সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন তাদের ধরে আনতে। ততক্ষণে ইহুদীরা লোহিত সাগরের



মোজেস্ ইহুদীদের লোহিত সাগর পার করে নিয়ে যাচ্ছেন

তীরে পৌঁছে গেছে। হঠাৎ পিছনে দেখা গেল ফেরোর অগণিত সৈন্য। ইহুদীরা প্রমাদ গণল। সামনে সমুদ্র, পালাবার পথ নেই। মোজেস্ তখন তাঁর হাতখানি জলের উপর ধরলেন। কি আশ্চর্য! অমনি সমুদ্র হুভাগ হয়ে মাঝখানে পথ করে দিল, ইহুদীরা ছুটে সমুদ্র পার

হতে লাগল। এদিকে ফেরোর সৈন্যরা তাদের পিছনে ধাওয়া করেছে। কিন্তু ইহুদীরা সকলে তীরে পৌঁছান মাত্র মোজেস্ আবার তাঁর হাতখানি জলের উপর ধরলেন; সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জলও এক হয়ে গেল, আর ফেরোর সৈন্যরা সব জলে ডুবে মারা গেল। এই ভাবে অত্যাচারী ফেরোর হাত থেকে উদ্ধার করে মোজেস্ ইহুদীদের প্যালেষ্টাইনের কাছে নিয়ে এলেন। এর অল্পকাল পরেই এই মহাপুরুষের মৃত্যু হয়।

ইহুদীদের দুঃখের দিনে মোজেস্ তাদের একমাত্র ভগবান জিহোবার উপর নির্ভর করতে শিখিয়েছিলেন। ইহুদীরা কি ভাবে জীবনযাপন করবে, সে সম্বন্ধে স্বয়ং জিহোবা মোজেস্‌কে দশটি উপদেশ দেন। এই উপদেশগুলি হল ঃ—

(১) ইহুদীরা জিহোবা ছাড়া অন্য কোন দেবতার পূজা করবে না। (২) মূর্তিপূজা করবে না। (৩) ভগবানের নামে অযথা শপথ করবে না। (৪) পবিত্র জীবন যাপন করবে। (৫) মাতাপিতাকে ভক্তি করবে। (৬) কাউকে হত্যা করবে না। (৭) নারীজাতির সম্মান রাখবে। (৮) চুরি করবে না। (৯) প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না। (১০) অন্যের দ্রব্যে লোভ করবে না।

মোজেসের মৃত্যুর পর ইহুদীরা প্যালেষ্টাইনে গিয়ে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করেছিল। রাজা ডেভিড ও তাঁর ছেলে সলোমনের রাজত্বকালে ইহুদীদের সবচেয়ে বেশী উন্নতি হয়। ডেভিড প্রথমে ছিলেন সামান্য মেষপালক। গোলিয়াথ নামে এক দুর্ধর্ষ শত্রুকে হত্যা করে ইহুদীদের রাজা সলের মেয়েকে বিয়ে করেন। সলের মৃত্যুর পর ডেভিড রাজা হন। তিনি খুব ধার্মিক ছিলেন। তাঁর রচিত ধর্মসঙ্গীত লোকে এখনও খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ে।

ডেভিডের মৃত্যুর পর সলোমন রাজা হন। তিনি খুব জ্ঞানী

ছিলেন এবং সুবিচারক বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর বিচার সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। একবার দুজন স্ত্রীলোক একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে ঝগড়া করতে করতে তাঁর সভায় আসে। দুজনেই বলে ছেলে তার, দুজনেই বিচার প্রার্থনা করে। রাজা সলোমন একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, "বেশ, ছেলেটিকে কেটে দুভাগ করে দুজনকে দেওয়া হবে।" একজন স্ত্রীলোক তাতেই রাজী হয়ে গেল। কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি কেঁদে উঠে বলল, "না, না, কাটবেন না, আমার দরকার নেই, ছেলে আপনি ওকেই দিন।" রাজা বুঝতে পারলেন যে শেষের স্ত্রীলোকটিই ছেলেটির মা, কারণ মা কখনও নিজের সন্তানকে কাটতে দিতে পারে না। তিনি তখন তাকেই ছেলেটি দিয়ে দিলেন। রাজা সলোমনের বিচারবুদ্ধি এমনই সূক্ষ্ম ছিল।

ইহুদীরা খুব ধর্মভীরু ছিল। তাদের ধর্মগুরুরা প্রচার করতেন, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁরা মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইহুদীদের সম্বন্ধে অনেক কাহিনী এবং তাদের ধর্মের কথা বাইবেলের "ওল্ড টেষ্টামেণ্ট" বা প্রাচীন অংশে সংগৃহীত আছে। খ্রীষ্টানরা তাদের কাছ থেকেই এই অংশটি পেয়েছে। আচার, ব্যবহার ও ধর্মমতের দিক দিয়ে ইহুদীরা অন্য সকলের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র বলে মনে করত। আজ পর্যন্তও তারা নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

সলোমনের মৃত্যুর পর ইহুদী রাজ্যের পতন হতে থাকে। ক্রমে তাদের স্বাধীনতাও নষ্ট হয়ে যায়। নানারকম অত্যাচারে জর্জরিত এবং রাজ্যহীন হয়ে ইহুদীরা পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই আজ এদের বংশধরদের প্রায় সকল দেশেই দেখতে পাওয়া যায়।

কালক্রম

খ্রীষ্টপূর্ব

আনুমানিক ৩০০০—২০০০—ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে ফিনিসীয় উপনিবেশ স্থাপন।

" ১২৫০—মোজেস্।

" ১০০০—ডেভিড।

" ৮০০—কার্থেজ শহরের প্রতিষ্ঠা।

" ৭২০—ইহুদী সাম্রাজ্যের পতন।

প্রশ্ন

১। ফিনিসিয়া দেশ কোথায় ছিল? ঐ দেশের দুটি বড় শহরের নাম কর। ফিনিসীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিবরণ দাও। ইউরোপের অধিবাসীরা ফিনিসীয়দের কাছে কোন্ কোন্ বিষয়ে ঋণী?

২। ইহুদীরা কোথায় বাস করত? তাদের রাজধানীর নাম কি? ইহুদীদের ধর্মমত সম্বন্ধে যা জান বল।

৩। মোজেস্ কে ছিলেন? ফেরোর অত্যাচার থেকে ইহুদীদের বাঁচাবার জন্য তিনি কি করেছিলেন? জিহোবার কাছ থেকে তিনি কি কি উপদেশ লাভ করেছিলেন?

৪। কোন্ সময়ে ইহুদীদের সব চেয়ে বেশী উন্নতি হয়েছিল?

ষষ্ঠ অধ্যায়

গ্রীসের শহর: এথেন্স এবং স্পার্টার জীবনযাত্রা

গ্রীস দেশটি পাহাড়-পর্বতে পরিপূর্ণ। সেকালে তারই মাঝে মাঝে এক একটি শহরকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে মেলামেশার তেমন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। সেইজন্য এখানে মিশর বা ব্যাবিলনের মত কোন বড় রাজ্য গড়ে উঠতে পারেনি। গ্রীসের ছোট ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে এথেন্স, স্পার্টা, করিন্থ এবং থিব্‌স্‌ই ছিল বিশেষ শক্তিশালী।

প্রত্যেক রাজ্যে প্রথমে এক একজন রাজা রাজত্ব করতেন। কিন্তু ক্রমে তাঁদের ক্ষমতা কমে যায়। এমন কি অনেক রাজ্যে রাজপদ উঠেই গিয়েছিল; সে সব জায়গায় গণ্যমান্য লোকেরা নিজেরা রাজকার্য পরিচালনা করতেন। এথেন্সে কিন্তু শুধু গণ্যমান্য লোকেরাই নন, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, সকল শ্রেণীর নাগরিক একত্র হয়ে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করতে পারত।

গ্রীসের শহরগুলিতে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল নিজ নিজ আদর্শ অনুযায়ী। এথেন্স এবং স্পার্টার কথা আলোচনা করলে আমরা এ সম্বন্ধে ভাল করে বুঝতে পারব।

এথেন্স—সুস্থ ও শিক্ষিত মানুষ তৈরী করা ছিল এথেন্সের আদর্শ। প্রত্যেকটি নাগরিকের দেহ এবং মন দুয়েরই যাতে উন্নতি হয় সেদিকে এথেন্সবাসীদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ছেলেরা সাধারণতঃ নিজ নিজ গৃহে শিক্ষালাভ করত। কোন কোন শিক্ষক নিজেদের বিদ্যালয়েও ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। ছেলেরা চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয়ে যেত। সেখানে তাদের ইতিহাস, সঙ্গীত, এবং ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম করতেও শেখান হত। মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা ছিল না, তারা বাড়ীতে ঘরকন্নার কাজ শিখত। সূতো কাটা, কাপড় বোনা, সূঁচের কাজ, গান-বাজনা এসব ছিল তাদের শিক্ষার অঙ্গ।

ষোল বছর বয়স হলে ছেলেরা শরীর-চর্চার দিকে বেশী নজর দিত। এর দু'বছর পর তাদের নাগরিকের কর্তব্য আর যুদ্ধবিদ্যা শেখান হত। এই ভাবে সব রকম শিক্ষা শেষ হ'লে যুবকেরা নিজেদের শহর রক্ষা করবার জন্য সেনানিবাসে বাস করত। তারপর তেইশ বছর বয়সে তারা রাজ্যের পূর্ণ নাগরিক হতে পারত এবং শাসন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করবার অধিকারী হত।

এথেন্সবাসীরা বেশীর ভাগ সময় কাটাত রাস্তায় আর বাজারে। সেখানে তারা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নানারকম গল্প-গুজব এবং আলাপ-আলোচনা করত। বিকালের দিকে তারা পরিষদের সভাগৃহে এসে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করত এবং বিচারকার্যে সাহায্য করত।

স্পার্টা—স্পার্টানদের আদর্শ ছিল কিন্তু একেবারে অন্য রকম। তারা চাইত নিজেদের বীরের জাতি করে গড়ে তুলতে। এইজন্য তাদের শিক্ষাপদ্ধতিও ছিল খুব কঠোর। বড় হয়ে স্পার্টান বালকেরা যাতে ভাল যোদ্ধা হতে পারে সেজন্য কতকগুলি নিয়ম করা হয়েছিল। লাইকারগাস্ নামে একজন মনীষী এই নিয়মগুলি প্রণয়ন করেছিলেন।

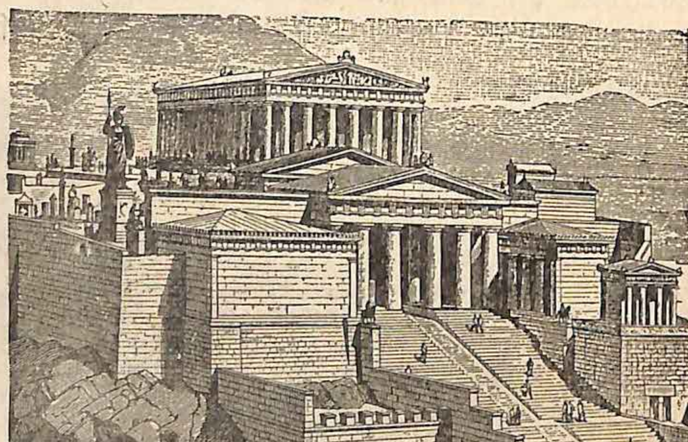


পেরিক্লিস্

স্পার্টায় জন্ম হবার পরেই শিশুকে পরীক্ষা করে দেখা হত সে সুস্থ এবং নীরোগ কি না। অসুস্থ এবং বিকলাঙ্গ-দের মেরে ফেলা হত। শিশুরা সাত বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের কাছে থাকত। তারপরে রাজ্যের শাসনকর্তারা তাদের শিক্ষার ভার নিতেন। তাদের দেহ যাতে সবল হয়, তারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর শারীরিক কষ্ট সহ্য করে যাতে প্রকৃত যোদ্ধা হতে পারে, কেবলমাত্র সেইদিকেই লক্ষ্য রেখে শিক্ষা দেওয়া হত। লেখাপড়ার দিকে

বিশেষ উৎসাহ ছিল না। গান-বাজনা বা কোন রকম সৌখীনতাকে স্পার্টানরা অন্যায় বলে মনে করত।

ত্রিশ বছর বয়সে স্পার্টান যুবকেরা বিবাহ করবার অনুমতি পেত। কিন্তু তাদের সৈন্য-শিবিরে থাকতে হত। ষাট বছর বয়স হলে তবে তারা বাড়ীতে থাকবার অনুমতি পেত। এইরকম কঠোর জীবন যাপন করত বলে স্পার্টানরা খুব দক্ষ যোদ্ধা হয়ে উঠেছিল আর তাদের বীরত্বের খ্যাতিও চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।



পার্থিনন

গ্রীসের যা কিছু সুন্দর এবং যা কিছু মহান, তা কিন্তু সৃষ্টি করেছিল এথেন্সবাসীরা। এথেন্সের চরম উন্নতি হয় পেরিক্লিসের সময়ে। সেখানকার নেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর সময়ে এথেন্সবাসীরা একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। তখন তাদের প্রতিপত্তি ভূমধ্য সাগরের পূর্ব অঞ্চলের দ্বীপগুলি ও তার আশে-পাশে

ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময়ে অনেক বড় বড় ভাস্কর, দার্শনিক, নাট্যকার ও ঐতিহাসিক এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই জন্য পেরিক্লিসের যুগকে এথেন্সের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

পারস্যদেশের একজন সম্রাট একবার এথেন্স শহর পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। পেরিক্লিস্ সেই ধ্বংসস্তূপের উপর আবার একটি নতুন শহর গড়ে তোলেন। তখনকার দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রীক ভাস্কর ফিডিয়াসের উপর এই শহরের শোভা আর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার ভার পড়ে। ফিডিয়াস্ অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্দির ও মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। এগুলির গঠন-কৌশল ও কারুকার্য দেখলে আজও লোকে অবাক হয়ে যায়। ফিডিয়াসের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল "পার্থিনন"। এটি এথেন্সের নগরদেবী "এথিনা"র মন্দির। মন্দিরটি আগাগোড়া মারবেল পাথরে গড়া। ফিডিয়াস্ এথিনার দুটি মূর্তি গড়েছিলেন। একটি তৈরী করেছিলেন সোনা আর হাতীর দাঁত দিয়ে; অন্যটি ছিল ব্রোঞ্জের তৈরী, প্রায় সত্তর ফুট উঁচু। বিদেশ থেকে আসবার সময়ে এথেন্সবাসীরা এই মূর্তিটিকে দেখে দূর থেকে শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করত। এথেন্সের আর একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর ছিলেন প্রাক্সিটিলিস্। তিনিও খুব সুন্দর সুন্দর মূর্তি গড়তে পারতেন।

গ্রীকদের মধ্যে তিন জন বড় বড় দার্শনিকের জন্ম হয়েছিল। তাঁদের নাম সক্রেটিস্, প্লেটো এবং অ্যারিস্টট্ল। সক্রেটিস্ ছিলেন জ্ঞানের সাগর। এথেন্সের রাস্তাঘাট ও বাজারে যখনই যার সঙ্গে দেখা হত তার সঙ্গেই তিনি নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। তাঁর প্রধান কথা ছিল, "জ্ঞান অর্জন কর এবং নিজেকে ভাল করে জান।" তখনকার সমাজে এবং ধর্মে যে সব দোষ-ত্রুটি ছিল সেগুলোও তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেন।

সক্রেটিসের নির্মল চরিত্র এবং অমূল্য সারগর্ভ উপদেশগুলিতে আকৃষ্ট হয়ে এথেন্সের বহু জ্ঞানী লোক এবং যুবক তাঁর কাছে যাতায়াত করত। কিন্তু একদল লোক যেমন তাঁকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করল, অন্য আর একদল তেমনই তাঁর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। এই শেষের দলের লোকেরা সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল যে, তিনি দেবতাদের অসম্মান করেছেন এবং যুবকদের বিপথে নিয়ে যাচ্ছেন। সক্রেটিসের বিচার হল এবং বিচারে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। সক্রেটিস্ অম্লান বদনে সেই দণ্ডাজ্ঞা মেনে নিলেন। এরপর তাঁকে এক মাস কারাগারে রেখে দেওয়া হল। এই সময়েও তিনি শিষ্যদের সঙ্গে আগের মতই আলাপ-আলোচনা করতেন। নির্দিষ্ট দিনে তিনি হাসিমুখে বিষপান করে মৃত্যুকে বরণ করেন।



সক্রেটিস্

প্লেটো ছিলেন সক্রেটিসের সব চাইতে প্রিয় শিষ্য। সক্রেটিস্ নিজে কোন বই লেখেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর প্লেটো গুরুর কথাগুলি প্রচার করতে থাকেন। তা ছাড়া তিনি নিজেও অনেক নতুন নতুন উপদেশ দিতেন। কি ভাবে চিন্তা করা উচিত, শাসনপদ্ধতি কেমন হলে ভাল হয়—এমনি নানা বিষয় নিয়ে তিনি অনেক বই লেখেন। তাঁর "দি রিপাবলিক" নামে বইতে আমরা একটি আদর্শ রাষ্ট্রের বর্ণনা

পাই। প্লেটো এথেন্সের এক বাগানে বসে শিক্ষা দিতেন। এই বাগানটির নাম ছিল "একাডেমি"।

অ্যারিস্টট্‌ল ছিলেন ম্যাসিডোনিয়ার অধিবাসী। প্লেটোর কাছে শিক্ষা লাভ করবার জন্য তিনি এথেন্সে আসেন। প্লেটোর মৃত্যুর পরে তিনি এথেন্সে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন; তার নাম ছিল লাইজিয়াম্। অ্যারিস্টট্‌লের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তখনকার দিনে এমন কোন বিষয় ছিল না যার সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নি বা লিখে যান নি। প্রত্যেকটি বিষয় তিনি ভাল করে বিচার করতেন, তাই তাঁকে বিজ্ঞানের স্রষ্টা বলা হয়। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি বিখ্যাত গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

গ্রীক নাট্যকারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—এস্কাইলাস্, সফোক্লিস্, ইউরিপিডিস্ ও অ্যারিস্টোফেনিস্। এঁরা সকলেই এথেন্সের অধিবাসী ছিলেন। পৌরাণিক কাহিনী ও নিজেদের সময়ের ঘটনা ও লোকজনদের নিয়ে এঁরা নাটক লিখতেন। এস্কাইলাস্‌কে গ্রীক নাটকের স্থষ্টিকর্তা বলা হয়ে থাকে। সালামিস উপসাগরে এক নৌযুদ্ধে গ্রীকরা পারসিকদের হারিয়ে দিয়েছিল, এই ঘটনা নিয়ে এস্কাইলাস্ একখানি স্থন্দর নাটক লেখেন। নাটকখানির নাম "পার্সী"।

গ্রীক ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় হেরোডোটাসের। হেরোডোটাস্ কিন্তু গ্রীসের লোক ছিলেন না। তাঁর বাড়ী ছিল এশিয়া মাইনরে। সেখান থেকে নির্বাসিত হয়ে তিনি কিছুদিন এথেন্সে বাস করেছিলেন। প্রচলিত গল্প, শিলালিপি, অন্য লোকের লেখা বই ইত্যাদি যোগাড় করে তিনি একখানি ইতিহাস লেখেন। এর আগে আর কেউ এমনভাবে ইতিহাস লেখেন নি, তাই তাঁকে ইতিহাসের জনক বলা হয়ে থাকে। গ্রীক ও

পারসিকদের যুদ্ধের ঘটনা নিয়েই হেরোডোটাস্ তাঁর ইতিহাসখানি রচনা করেছিলেন।

থুসিডিডিস্ ছিলেন প্রাচীন কালের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। তিনি এথেন্সের নাগরিক ছিলেন। স্পার্টার সঙ্গে এথেন্সের অনেক বছর ধরে যুদ্ধ হয়েছিল। এর ফলেই এথেন্সের সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। থুসিডিডিস্ এই যুদ্ধে যোগ দেন। তাঁর উপর একটি জায়গা রক্ষা করার ভার পড়ে। কিন্তু তিনি তা রক্ষা করতে না পারায় তাঁকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। এই সময়ে তিনি স্পার্টা ও এথেন্সের মধ্যে যুদ্ধের ইতিহাস লেখেন। তিনি কোন দলের দিকে পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে, কেবল সত্যি ঘটনা অবলম্বন করে এই ইতিহাস লিখেছিলেন। তাই তাঁর বইখানি এখনও লোকে আগ্রহ করে পড়ে।


থুসিডিডিস্

দু হাজার বছরেরও আগে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে এথেন্স যে কত উন্নতি করেছিল তা ভাবলে সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। পেরিক্লিস্ গর্ব করে বলেছিলেন, এথেন্স হল সমস্ত গ্রীসের বিদ্যায়তন। এই রকম গর্ব করবার অধিকার এথেন্সবাসীদের সত্যি সত্যিই ছিল।

প্রশ্ন

১। এথেন্সের শাসন-ব্যবস্থা কি রকম ছিল? সেখানকার লোকদের বাল্যকাল থেকে কি কি শিক্ষা দেওয়া হত?

২। স্পার্টানদের শিক্ষাপ্রণালী বর্ণনা কর। তাদের শিক্ষার কি আদর্শ ছিল?

৩। পেরিক্লিস্ কে ছিলেন? তাঁর সময়কে এথেন্সের স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন?

৪। গ্রীস দেশের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ (ক) দার্শনিক, (খ) নাট্যকার, (গ) ভাস্কর এবং (ঘ) ঐতিহাসিকের নাম কর।

সপ্তম অধ্যায়

পারসিক ও গ্রীকদের যুদ্ধ

আসিরীয়রা পশ্চিম এশিয়ায় অনেকদিন রাজত্ব করেছিল। কিন্তু আসুরবানিপালের মৃত্যুর পর তাদের দুর্দিন ঘনিয়ে আসতে থাকে। তাদের মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হয় এবং চারদিকে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই সুযোগে ব্যাবিলন ও মিডিয়ার অধীন রাজারা একত্র হয়ে তাদের অক্রমণ করলেন এবং রাজধানী নিনেভে শহরটি পুড়িয়ে দিলেন। এর সঙ্গে সঙ্গে আসিরীয় সাম্রাজ্যও চিরকালের মত লোপ পেয়ে গেল।

এর পর মিডিয়ার রাজারা কিছুকালের জন্য শক্তিশালী হয়ে উঠছিলেন। তাঁরা ইরানের পশ্চিম অঞ্চলে রাজত্ব করতেন এবং প্রাচীন আর্যদের ভাষায় কথা বলতেন। আশেপাশের রাজ্যগুলি জয় করে তাঁরা একটি বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে তাঁরা নিজেদের ভাষা আর বর্ণমালার প্রচলন করেন এবং প্রজাদের কলম দিয়ে চামড়ার ওপর লিখতে শেখান। এই সময় থেকেই মাটির টালির উপর লেখার প্রথা ক্রমে লোপ পেতে থাকে।

মিডিয়াবাসীদের সাম্রাজ্য কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। তাদের নিকটতম জ্ঞাতি ছিল পারসিকরা। তারা পারস্য উপসাগরের কাছে বাস করত। পারসিকদের রাজা সাইরাস্ মিডিয়ার শেষ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। সাইরাস্ সেকালের একজন বড় রাজা ছিলেন। তিনি পশ্চিম এশিয়ার বহু দেশ জয় করেছিলেন। ব্যাবিলনও তাঁর অধিকারে এসেছিল। এদিকে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। বীরত্বের জন্য লোকে তাঁকে "শ্রেষ্ঠ রাজা সাইরাস্" বলত। সাইরাসের ছেলে ক্যামবাইসিজ্ও একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। তিনি মিশর দেশ জয় করেছিলেন।

পারসিক সম্রাটদের মধ্যে কিন্তু প্রথম দারায়ুস্ই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর সময়ে পারসিক সাম্রাজ্য ইউরোপের দানিয়ুব নদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। তিনি ভারতবর্ষের সিন্ধু নদের তীরের রাজ্যগুলিও জয় করেছিলেন। ভারতবর্ষের লোকেরা তাঁকে কর হিসাবে প্রচুর সোনার গুঁড়ো দিত। ব্যাবিলন থেকে পারস্য যাওয়ার পথে একটি পাহাড়ের গায়ে দারায়ুসের রাজত্বের কাহিনী তিনটি ভাষায় খোদাই করা আছে। সম্রাট তাঁর শত্রুদের পদদলিত করছেন, এইরকম একটি খোদাই-করা চিত্রও আঁকা আছে।



দারায়ুস্

শেষজীবনে দারায়ুস্ গ্রীস জয় করবার চেষ্টা করেন। তাঁর এক রাণী অনেক আগেই তাঁকে এবিষয়ে উত্তেজিত করেছিলেন,

কিন্তু তখন তিনি বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। তারপর যখন এথেন্সবাসীরা পারসিক সাম্রাজ্যের একটি শহর পুড়িয়ে দিল, তখন সম্রাট দারায়ুস্ সৈন্য পাঠিয়ে তাদের শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করলেন।

অভিযান পাঠাবার আগে "মাটি আর জল" দাবি করে দারায়ুস্ গ্রীসের প্রত্যেক শহরে দূত পাঠালেন। মাটি আর জল দেওয়া



গ্রীক ও পারসিক সৈন্য

মানেই বশ্যতা স্বীকার করা। গ্রীসের বহু শহর এ দাবি মেনে নিল। কিন্তু এথেন্সে যে দূত গেল, তাকে এথেন্সবাসীরা মেরে ফেলে কবর দিল, আর স্পার্টায় যে দূত গেল, তাকে স্পার্টানরা কুয়োর জলে ফেলে দিল।

দারায়ুস্ এই খবর পেয়ে রেগে আগুন হয়ে গেলেন। এ অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি জাহাজে করে বহু সৈন্য গ্রীসের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। পারসিক সৈন্যরা এথেন্স থেকে

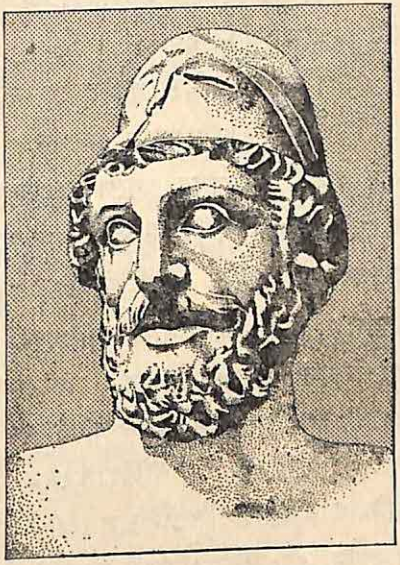
কিছুদূরে ম্যারাথনের প্রান্তরে এসে নামল। এথেন্সবাসীরা দেখল ভয়ানক বিপদ, তাই অবিলম্বে সাহায্য চেয়ে তারা স্পার্টায় দূত পাঠাল। কিন্তু সেখানে তখন এক ধর্মোৎসব চলছিল, তাই স্পার্টানরা তখনই আসতে পারল না। এথেন্সবাসীরা কিন্তু তাদের জন্য অপেক্ষা না করে নিজেরাই পারসিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেল। পারসিকরা তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করতে বিশেষ দক্ষ ছিল, সংখ্যাতেও তারা ছিল অনেক বেশী। কিন্তু তাদের তীর গ্রীকদের গায়ের লোহার বর্ম ভেদ করতে পারল না। বিপুল পারসিক বাহিনীকে হারিয়ে দিয়ে মুষ্টিমেয় গ্রীক সৈন্য ম্যারাথনের যুদ্ধে জয় লাভ করল।

এদিকে এথেন্সবাসীরা যুদ্ধের ফলাফল জানবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। এমন সময়ে দেখা গেল একজন লোক উল্কার মত বেগে শহরের দিকে দৌড়ে আসছে। খবর জানবার জন্য সকলে তার দিকে ছুটে গেল। "আমাদেরই জয় হয়েছে"—এই কটি কথা বলেই লোকটি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন-দীপ নিভে গেল। এই বীরের নাম ফিডিপ্পিডিস্। জীবন পণ করা তাঁর এই দৌড়কে চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্যই "ম্যারাথন রেস" প্রচলন করা হয়েছে।

গ্রীকদের কাছে সে-যাত্রা পারসিকদের হার হল বটে, কিন্তু দারায়ুস্ হাল ছাড়লেন না। তিনি আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। কিন্তু যুদ্ধ করা তাঁর আর হয়ে উঠল না; কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হল।

এরপর পারস্যের সম্রাট হলেন দারায়ুসের পুত্র জার্কসিজ। তিনি পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। এবার জল এবং স্থল দুদিক দিয়েই গ্রীস অক্রমণের ব্যবস্থা করা হল।

জার্কসিজ তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটি দেশ থেকে অসংখ্য সাহসী ও যুদ্ধকুশল সৈন্য আনাতে লাগলেন। আমাদের ভারতবর্ষ থেকে গেল সুদক্ষ তীরন্দাজ সৈন্য। সম্রাটের নিজেরও দশ হাজার শরীর-রক্ষক সৈন্য ছিল। এরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। দার্দানালিস্ প্রণালী পার হবার জন্য সেতু তৈরী করা হল, কিন্তু সমুদ্রের জলে তা ভেসে গেল। রাগে সম্রাট সমুদ্রকে তিনশ' চাবুক মারবার জন্য হুকুম দিলেন আর সে হুকুম তামিল করাও হল। তারপর আবার আরও শক্ত করে নতুন সেতু তৈরী করা হল। সৈন্যরা যখন এই সেতু পার হচ্ছিল তখন সমুদ্রের তীরে মারবেল পাথরের সিংহাসনের ওপর বসে সম্রাট গর্বভরে সেই দৃশ্য দেখতে লাগলেন। খাবার-দাবার ও অন্য জিনিসপত্র নিয়ে অসংখ্য জাহাজ উপকূল বেয়ে সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। জার্কসিজ এবার নিজেই সৈন্যদের নিয়ে গ্রীসে গেলেন।



লিওনিডাস্

এদিকে গ্রীকরাও নিশ্চিন্ত ছিল না। তারাও শত্রুদের বাধা দেবার জন্য তৈরী হয়েছিল। স্পার্টার রাজা লিওনিডাস্ তিনশ' স্পার্টান বীর

সঙ্গে নিয়ে থার্মপিলির সঙ্কীর্ণ গিরিপথ আগলে রইলেন। গ্রীসের মধ্যে প্রবেশ করবার এটাই ছিল সোজা পথ। লিওনিডাস্‌কে সাহায্য করবার জন্য আর মাত্র সাত হাজার গ্রীক সৈন্য ছিল। গ্রীকদের সৈন্যসংখ্যা এত কম দেখে জার্কসিজ্ প্রথমে অবাক হয়ে গেলেন। তারপর তিনি যখন খবর নিয়ে জানলেন যে, গ্রীক সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত না হয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে আর ব্যায়াম করছে, তখন তাঁর আর বিস্ময়ের সীমা রইল না।

জার্কসিজ লিওনিডাসের কাছে দূত পাঠালেন অস্ত্র ত্যাগ করতে বলে। লিওনিডাস্ জবাব দিলেন, "সম্রাট যেন নিজে এসে অস্ত্র নিয়ে যান।" এরপর দুপক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধল। কিন্তু পারসিকরা বহু চেষ্টা করেও গিরিসঙ্কট পার হতে পারল না। এই সময়ে একজন বিশ্বাসঘাতক গ্রীক জার্কসিজ্‌কে একটি গুপ্ত পথের সন্ধান দিল। পারসিক সৈন্যরা সেইপথে গ্রীকদের পিছনে গিয়ে উপস্থিত হল। লিওনিডাস্ দেখলেন বিষম সঙ্কট। তিনি নিজের কাছে তাঁর তিনশ' স্পার্টান সৈন্য রেখে বাকী সব সৈন্যদের পিছন দিকে পাঠিয়ে দিলেন। তার পরের ইতিহাস যেমন বীরত্বপূর্ণ, তেমনি করুণ। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও লিওনিডাস্ প্রবল বিক্রমে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং বীরের মতই মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন। থার্মপিলির যুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়ে স্পার্টার বীরেরা ইতিহাসে যে নাম রেখে গেল তা আজও অমর হয়ে রয়েছে।

যুদ্ধ জয় করে জার্কসিজ্ সসৈন্যে এথেন্সে এসে পৌঁছুলেন এবং শহরটি পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলেন। পারসিকদের এ জয় কিন্তু স্থায়ী হল না। তাদের যে জাহাজগুলি সমুদ্রপথে এসেছিল, সেগুলিকে বাধা দেবার জন্য গ্রীক

নৌবহর স্যালামিসের সঙ্কীর্ণ উপসাগরে অপেক্ষা করছিল। একদিন তারা প্রচণ্ড আক্রমণ করে পারসিক নৌবহরকে হারিয়ে দিল। এই পরাজয়ে জার্কসিজ্ খুবই দমে গেলেন। তিনি অর্ধেক সৈন্য গ্রীসে রেখে বাকি অর্ধেক নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। গ্রীকদের তখন মহা উৎসাহ। বিপুল বিক্রমে তারা বাকী শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করে পরাজিত করল।

স্যালামিসের যুদ্ধের ফলেই সমস্ত গ্রীস দেশ পরাধীনতার হাত থেকে রক্ষা পেল। তখন গ্রীকদের মনে নতুন উৎসাহ জেগে উঠল। সমস্ত দিক থেকে বিপদ্‌মুক্ত হবার পর গ্রীসের ইতিহাসে এক নতুন যুগ আরম্ভ হল। এই সময়ই পেরিক্লিস ছিলেন এথেন্সের অধিনায়ক।

গ্রীকদের কাছে বার বার পরাজিত হলেও পারসিকদের শক্তি কিন্তু খুব বেশী খর্ব হল না। তারা পশ্চিম এশিয়ায় আরও প্রায় দেড়শ' বছর প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেছিল।

কালক্রম

গ্রীষ্টপূর্ব

৬১২—আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতন
৫৫৮—সাইরাস্ কর্তৃক পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
৫২২—দারায়ুসের সিংহাসন আরোহণ
৪৯১-৯০—ম্যারাথনের যুদ্ধ
৪৮৬—জার্কসিজের সিংহাসন আরোহণ
৪৮০—থার্মপিলি ও স্যালামিসের যুদ্ধ
৪৬১—পেরিক্লিস্

প্রশ্ন

১। কি ভাবে আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতন হয়?

২। মিডিয়ার রাজারা প্রজাদের কি কি শিখিয়েছিলেন?

৩। পারস্য সাম্রাজ্য কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? এই সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?

৪। গ্রীকদের সঙ্গে পারসিকদের কেন যুদ্ধ হয়েছিল? এই যুদ্ধের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও ফলাফল বর্ণনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

মহাবীর ও বুদ্ধদেব

আর্যদের ধর্মবিশ্বাস ও পূজাপদ্ধতি প্রথমে খুব সরল ছিল। কিন্তু যতই দিন কেটে গেল, ততই তাদের মধ্যে আচার-অনুষ্ঠানও বাড়তে লাগল। শেষে এমন হল যে যাগযজ্ঞ, পশুবলি প্রভৃতিই লোকের কাছে হয়ে উঠল বড়; আসল দেবতাদের প্রতি তাদের কোন লক্ষ্য রইল না। জ্ঞানী ও ধার্মিকরা এসব দেখে খুব নিন্দা করতে লাগলেন। বিশেষ করে যজ্ঞের সময়ে যে পশু বলি দেওয়া হত তা দেখে তাঁরা খুবই কষ্ট বোধ করতেন। এইজন্য অনেকে বৈদিক ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেললেন। এই সময়ে কয়েকটি নতুন ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মই প্রধান।



মহাবীর

মহাবীর—এখন থেকে আড়াই হাজার বছর আগে বর্ধমান মহাবীর জৈনধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর পিতা উত্তর বিহারে বৈশালীতে রাজত্ব করতেন। রাজপ্রাসাদের সুখ-সম্পদের দিকে বর্ধমানের কোন আকর্ষণ ছিল না। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি সংসার

ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান। এরপর তিনি বারো বছর ধরে কঠোর তপস্যা করে সিদ্ধি লাভ করেন। তখন তাঁর নাম হয় "জিন" অর্থাৎ জয়ী এবং "মহাবীর"। "জীবে দয়া কর, সত্য কথা বল এবং জিতেন্দ্রিয় হও"—এই ছিল তাঁর প্রধান উপদেশ। ত্রিশ বছর ধরে তিনি ধর্মপ্রচার করেছিলেন। বাহাত্তর বছর বয়সে বিহারের পাবা গ্রামে তিনি দেহত্যাগ করেন। আজও ভারতের অনেক লোক শ্রদ্ধার সঙ্গে মহাবীরের ধর্মমত এবং উপদেশগুলি পালন করে থাকেন।

বুদ্ধদেব—বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সিদ্ধার্থ গৌতম। তিনি ও মহাবীর প্রায় একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেকালে নেপালের দক্ষিণে কপিলাবস্তু নামে একটি শহর ছিল। শাক্য বংশের রাজা শুদ্ধোদন সেখানে রাজত্ব করতেন। সিদ্ধার্থ ছিলেন রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র।



বুদ্ধদেব

ছোটবেলা থেকেই সিদ্ধার্থ খুব চিন্তাশীল ছিলেন। কারুর

কোনও রকম দুঃখ-কষ্ট দেখলে তাঁর কোমল মন ব্যথায় ভরে যেত। সংসারেও তাঁর মন বসত না। এই সব দেখে তাঁকে সংসারের দিকে আকৃষ্ট করবার জন্য শুদ্ধোদন তাঁর বিবাহ দিলেন।

একবার নগর-ভ্রমণে বেরিয়ে সিদ্ধার্থ একজন বৃদ্ধ, একজন রুগ্ন ব্যক্তি এবং একটি মৃতদেহ দেখতে পান। এতে তাঁর মন খুব ব্যাকুল হয়ে পড়ে। সিদ্ধার্থ ভাবতে লাগলেন যে, এ সংসারে তা হলে কোন সুখ নেই। কিন্তু এরপর যখন তিনি একজন সন্ন্যাসীর শান্ত সৌম্য মূর্তি দেখলেন, তখন তাঁর মনে হল সংসারে এইরকম লোকই প্রকৃত সুখী। ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হল। এই সময়ে তাঁর একটি পুত্র হয়। তখন তিনি আরও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি দেখলেন যে, ক্রমেই তিনি সংসারে জড়িয়ে পড়ছেন। শেষে একদিন গভীর রাত্রে কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি গৃহত্যাগ করলেন।

গৃহত্যাগের পর সিদ্ধার্থ বিহারের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। দুজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি কিছুদিন শাস্ত্র আলোচনাও করলেন। কিন্তু কোথাও শান্তি পেলেন না। তারপর গয়ার কাছে এক গ্রামে গিয়ে তিনি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, সিদ্ধার্থ একমনে ধ্যান করেই চলেছেন। ক্রমে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, শরীরকে কষ্ট দিয়ে তপস্যা করলে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা যায় না। তখন তিনি তপস্যা ছেড়ে নদীতে স্নান করলেন। এই সময়ে সুজাতা নামে একজন ভক্তিমতী গ্রাম্য রমণী তাঁকে এক বাটি পায়েস খেতে দেন। তাই খেয়ে সুস্থ হয়ে তিনি বোধগয়াতে একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। এইবার তিনি প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান পেলেন। তখন থেকেই তিনি বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী বলে সকলের কাছে পরিচিত হন।

কাশীর কাছে মৃগদাবে (এখনকার সারনাথে) বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মমত প্রথম প্রচার করেন। এখানে পাঁচ জন লোক তাঁর শিষ্য হলেন। এরপর প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তিনি ও তাঁর শিষ্যেরা রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, বৈশালী, কপিলাবস্তু প্রভৃতি নগরে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। আশী বছর বয়সে গোরখপুর জেলার কুশীনগরে বুদ্ধদেব মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।



বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ

বুদ্ধদেব বেদ মানতেন না। তিনি যাগযজ্ঞ, পশুবলির নিন্দা করতেন। সংসারের ভোগবিলাসও যেমন তিনি পছন্দ করতেন না, তেমনি কঠোর তপস্যা করতেও তিনি বারণ করতেন। তিনি বলতেন, মাঝামাঝি পথই শ্রেষ্ঠ পথ। দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তিলাভ করবার জন্য তিনি সকলকে সব রকম বাসনা এবং জীবহিংসা ত্যাগ করে সৎজীবন যাপন করতে উপদেশ দিতেন। মুক্তিলাভের জন্য তিনি সকলকে যে পথ দেখিয়েছিলেন তাকে "অষ্টাঙ্গিক মার্গ" বলা হয়।

বুদ্ধদেব তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদের নিয়ে এক সঙ্গে বাস করতেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের এইরকম দলকে বলা হত সঙ্ঘ। কোন জাতির

কোনও রকম দুঃখ-কষ্ট দেখলে তাঁর কোমল মন ব্যথায় ভরে যেত। সংসারেও তাঁর মন বসত না। এই সব দেখে তাঁকে সংসারের দিকে আকৃষ্ট করবার জন্য শুদ্ধোদন তাঁর বিবাহ দিলেন।

একবার নগর-ভ্রমণে বেরিয়ে সিদ্ধার্থ একজন বৃদ্ধ, একজন রুগ্ন ব্যক্তি এবং একটি মৃতদেহ দেখতে পান। এতে তাঁর মন খুব ব্যাকুল হয়ে পড়ে। সিদ্ধার্থ ভাবতে লাগলেন যে, এ সংসারে তা হলে কোন সুখ নেই। কিন্তু এরপর যখন তিনি একজন সন্ন্যাসীর শান্ত সৌম্য মূর্তি দেখলেন, তখন তাঁর মনে হল সংসারে এইরকম লোকই প্রকৃত সুখী। ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হল। এই সময়ে তাঁর একটি পুত্র হয়। তখন তিনি আরও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি দেখলেন যে, ক্রমেই তিনি সংসারে জড়িয়ে পড়ছেন। শেষে একদিন গভীর রাত্রে কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি গৃহত্যাগ করলেন।

গৃহত্যাগের পর সিদ্ধার্থ বিহারের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। দুজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি কিছুদিন শাস্ত্র আলোচনাও করলেন। কিন্তু কোথাও শান্তি পেলেন না। তারপর গয়ার কাছে এক গ্রামে গিয়ে তিনি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, সিদ্ধার্থ একমনে ধ্যান করেই চলেছেন। ক্রমে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, শরীরকে কষ্ট দিয়ে তপস্যা করলে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা যায় না। তখন তিনি তপস্যা ছেড়ে নদীতে স্নান করলেন। এই সময়ে সুজাতা নামে একজন ভক্তিমতী গ্রাম্য রমণী তাঁকে এক বাটি পায়েস খেতে দেন। তাই খেয়ে সুস্থ হয়ে তিনি বোধগয়াতে একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। এইবার তিনি প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান পেলেন। তখন থেকেই তিনি বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী বলে সকলের কাছে পরিচিত হন।

কাশীর কাছে মৃগদাবে (এখনকার সারনাথে) বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মমত প্রথম প্রচার করেন। এখানে পাঁচ জন লোক তাঁর শিষ্য হলেন। এরপর প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তিনি ও তাঁর শিষ্যেরা রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, বৈশালী, কপিলাবস্তু প্রভৃতি নগরে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। আশী বছর বয়সে গোরখপুর জেলার কুশীনগরে বুদ্ধদেব মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।



বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ

বুদ্ধদেব বেদ মানতেন না। তিনি যাগযজ্ঞ, পশুবলির নিন্দা করতেন। সংসারের ভোগবিলাসও যেমন তিনি পছন্দ করতেন না, তেমনি কঠোর তপস্যা করতেও তিনি বারণ করতেন। তিনি বলতেন, মাঝামাঝি পথই শ্রেষ্ঠ পথ। দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তিলাভ করবার জন্য তিনি সকলকে সব রকম বাসনা এবং জীবহিংসা ত্যাগ করে সৎজীবন যাপন করতে উপদেশ দিতেন। মুক্তিলাভের জন্য তিনি সকলকে যে পথ দেখিয়েছিলেন তাকে "অষ্টাঙ্গিক মার্গ" বলা হয়।

বুদ্ধদেব তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদের নিয়ে এক সঙ্গে বাস করতেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের এইরকম দলকে বলা হত সঙ্ঘ। কোন জাতির

লোকেরই বুদ্ধদেবের শিষ্য হতে বাধা ছিল না। এঁদের মধ্যে যেমন বিম্বিসারের মত রাজা, অনাথপিণ্ডদের মত ধনী বণিক এবং সারিপুত্ত ও মোগ্‌গলায়নের মত উচ্চ বংশের সন্তান ছিলেন, তেমনই আবার আনন্দ এবং উপালির মত দীন দরিদ্রও ছিলেন।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা রাজগৃহে মিলিত হন, এবং তাঁর উপদেশগুলি সংগ্রহ করে কয়েকখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। বৌদ্ধদের এই ধর্মগ্রন্থগুলির নাম "ত্রিপিটক"।

বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে এদেশে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। বৌদ্ধরা মনে করেন যে, তিনি বহুবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পূর্ব জীবনের কাহিনীগুলি সংগ্রহ করে যে সব গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে সেগুলি "জাতক" নামে পরিচিত।

কালক্রম

বুদ্ধের জন্ম (আনুমানিক)—৫৬৬ খ্রীঃ পূঃ
মহাপরিনির্বাণ—৪৮৬ খ্রীঃ পূঃ

প্রশ্ন

১। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি কেন হয়েছিল?
২। মহাবীর কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে যা জান বল।
৩। বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনী বর্ণনা কর।
৪। বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের কি কি উপদেশ দিতেন?
৫। ত্রিপিটক ও জাতক বলতে কি বোঝায়?

নবম অধ্যায়

কনফুসিয়াস

বুদ্ধদেব যে সময়ে ভারতবর্ষে তাঁর অমর বাণী প্রচার করেছিলেন ঠিক সেই সময়ে চীনদেশেও একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। বুদ্ধদেবের মত তিনিও মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন। এই মহাপুরুষের নাম কনফুসিয়াস। কনফুসিয়াস নাকি দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর অন্তর ছিল পবিত্র ও সুন্দর। চীনবাসীরা তাঁকে তাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলে মনে করে।



কনফুসিয়াস

কনফুসিয়াসের বয়স যখন তিন বছর, তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। মাকে সাহায্য করবার জন্য তাঁকে অতি অল্প বয়স থেকেই চাকরি করতে হ'ত; তাই প্রথম বয়সে তিনি লেখাপড়া শিখবার সুযোগ পান নি। তবে চীনের প্রথামত তাঁকে সঙ্গীত এবং ধনুর্বিদ্যা শিখতে হয়েছিল।

এই সময়ে চীনদেশের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। চাউ বংশের রাজারা তখন এখানে রাজত্ব করতেন। এঁদের মধ্যে একজন

রাজা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেশের জমিদারেরা বিদ্রোহ করল এবং তারা নিজেরাই নানাস্থানে রাজা হয়ে বসল। কিন্তু এরাও পরস্পরের সঙ্গে সর্বদাই মারামারি কাটাকাটি করত, আর প্রজাদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করত। এর উপর আবার উত্তর দিক থেকে অসভ্য জাতির লোকেরা মধ্যে মধ্যে চীনে হানা দিতে লাগল। ফলে দেশের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল, সাধারণ লোকের দুঃখ-কষ্টের আর সীমা রইল না।

কি করে দেশের দুরবস্থার প্রতিকার করা যেতে পারে, আগেই বা কেন এরকম দুঃখ-কষ্ট ছিল না—কনফুসিয়াস এই সব কথা ভাবতে লাগলেন আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রাচীন ইতিহাস চর্চা করতে লাগলেন। ক্রমে প্রাচীনকালের রীতিনীতির উপর তাঁর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তিনি বুঝলেন, দেশের লোকের নৈতিক অধঃপতনই দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ। মানুষ যদি চরিত্রবান হয়, তার মন যদি সুন্দর আর মহান হয়, তবেই সমাজে শান্তি থাকতে পারে।

এই নৈতিক শিক্ষা প্রচার করবার জন্য কনফুসিয়াস শিক্ষকতা আরম্ভ করলেন। এজন্য তিনি বিশেষ কোন বেতন নিতেন না। ছাত্ররা যে যা দিত, তাই দিয়েই তাঁর চলে যেত। আমাদের দেশে যেমন ছাত্ররা গুরুগৃহে বাস করত, কনফুসিয়াসের ছাত্ররাও তেমনি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে থাকত। প্রাচীন ইতিহাস, পৌরাণিক গাথা, ভদ্র আচার-ব্যবহার এইসব বিষয় নিয়ে তিনি ছাত্রদের সঙ্গে মুখে মুখে আলোচনা করতেন।

অল্পকালের মধ্যেই কনফুসিয়াসের গভীর জ্ঞানের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে দেশের একজন বড় জমিদার তাঁকে একটি শহরের শাসনকর্তা করে দিলেন। তখন কনফুসিয়াস

সেই শহরের অধিবাসীদের জন্য কতকগুলি আইন করলেন এবং তাতে বলে দেওয়া হল নগরবাসীরা তাদের জীবন কিভাবে যাপন করবে। এমন কি, তারা কি খাবে, কি পরবে, তার জন্যও কনফুসিয়াস কতকগুলি নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন। তাঁর শাসনে সেই শহরের অধিবাসীদের খুব উন্নতি হয়েছিল; তাদের মধ্যে সুখ ও শান্তি ফিরে এসেছিল। কিন্তু কনফুসিয়াস শুধু এতেই খুশী হতে পারলেন না। কিছুদিন পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি শিষ্যদের নিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর বারো বছর ধরে তিনি চীনের নানা জায়গায় তাঁর উপদেশগুলি প্রচার করলেন।

কনফুসিয়াসের শেষ জীবন সুখের হয়নি। তাঁর একমাত্র পুত্র আর অতি প্রিয় দুজন শিষ্যের পর পর মৃত্যু হল। এতে তাঁর শরীর ও মন ভেঙে পড়ল। এর কিছু কালের মধ্যেই তিনি দেহত্যাগ করলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল বাহাত্তর বছর।

কনফুসিয়াস বলতেন, সংসার ত্যাগ করবার কোন দরকার নেই— সংসারে বাস করেই সমাজকে উন্নত করতে হবে, তবেই সুখশান্তি আসবে। প্রাচীন কাল থেকে যে রীতিনীতি চলে আসছে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। পিতামাতা আর গুরুজনদের ভক্তি করবে, প্রত্যেকের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, দেশের রাজাকে প্রজারা পিতার মত দেখবে এবং রাজাও প্রজাদের সন্তানের মত পালন করবেন। এইভাবে জীবন যাপন করলে দেশে কোন রকম অশান্তিই থাকতে পারে না। মোটের উপর ভাল নাগরিক হতে হলে এবং জনসাধারণের সেবা করতে হলে, যে সব গুণ থাকা দরকার, তিনি সবাইকে তাই শেখাতেন। পরকে তিনি যে সব উপদেশ দিতেন, নিজেও তিনি সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। কনফুসিয়াসের মৃত্যুর পর

চীনের লোকেরা তাঁর উপদশগুলি মেনে নিয়েছিল। সে সময় থেকে বহুকাল পর্যন্ত সেগুলিই ছিল চীনবাসীদের আদর্শ।

কালক্রম

কনফুসিয়াসের জন্ম—৫৫১ খ্রীঃ পূঃ
মৃত্যু—৪৭৮ খ্রীঃ পূঃ

প্রশ্ন

১। কনফুসিয়াস কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? তাঁর সময়ে চীনের কি রকম অবস্থা হয়েছিল?

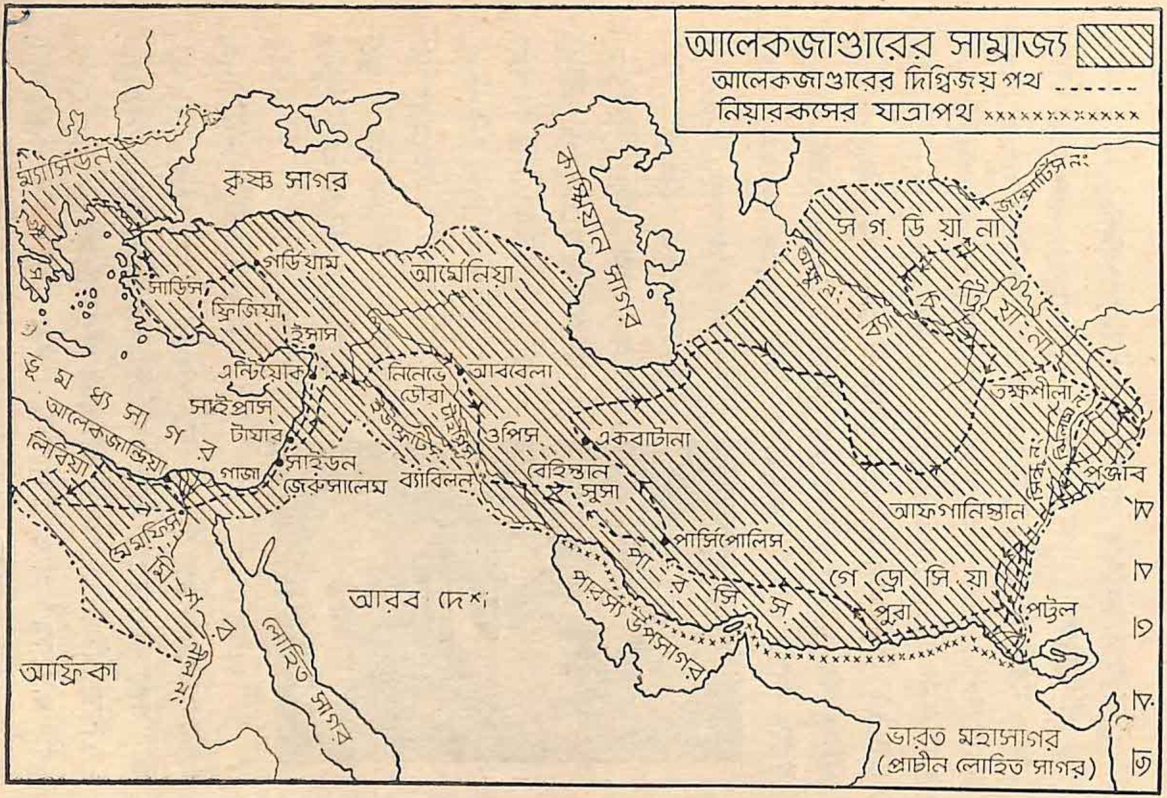
২। দেশের দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য কনফুসিয়াস সকলকে কি কি উপদেশ দিতেন? তিনি কি ভাবে লোককে শিক্ষা দিতেন?

দশম অধ্যায়

আলেকজাণ্ডার, পুরু এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

পারসিকরা গ্রীস আক্রমণ করবার প্রায় দেড়শ' বছর পরে গ্রীকদের মধ্যে একজন অসাধারণ বীরের জন্ম হয়েছিল। তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের সমস্তটাই জয় করে নিয়েছিলেন। এই দিগ্বিজয়ী বীরের নাম আলেকজাণ্ডার।

সেকালে উত্তর গ্রীসে ম্যাসিডন নামে একটি রাজ্য ছিল। আলেকজাণ্ডারের পিতা ফিলিপ ছিলেন সেখানকার রাজা। তিনি একটি দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী গড়ে ম্যাসিডনকে খুব শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। এই সময়ে গ্রীকরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগে ফিলিপ সমস্ত গ্রীস দেশটি জয় করেন।



আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য
আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় পথ
নিয়ারকসের যাত্রাপথ
ম্যাসিডন
কৃষ্ণ সাগর
কাস্পিয়ান সাগর
গর্ডিয়াম
আর্মেনিয়া
সাডিস
ফ্রিজিয়া
ইসাস
এন্টিয়োক
নিনেভে
আরবেলা
সাইপ্রাস
টায়ার
সাইডন
গাজা
জেরুসালেম
ব্যাবিলন
ওপিস
একবাটানা
বেহিস্তান
সুসা
পার্সিপোলিস
ভূ ম ধ্য সা গ র
আলেকজান্দ্রিয়া
লিবিয়া
মেমফিস
আরব দেশ
লোহিত সাগর
আফ্রিকা
পারস্য উপসাগর
স গ ডি য়া না
তক্ষশীলা
পঞ্জাব
আফগানিস্তান
গে ড্রো সি য়া
পুরা
পট্টল
ভারত মহাসাগর
(প্রাচীন লোহিত সাগর)

পুত্র আলেকজাণ্ডার যাতে সব দিক দিয়ে সুশিক্ষিত হতে পারেন ফিলিপ সেজন্য খুব ভাল ব্যবস্থা করেছিলেন। তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অ্যারিস্টট্‌লকে ডেকে তিনি তাঁর উপর পুত্রের শিক্ষার ভার দেন। গুরুর কাছ থেকে আলেকজাণ্ডার নানা বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে ভাল লাগত হোমারের কাব্য দুখানি। তিনি প্রাচীনকালের গ্রীক বীরদের কথা পড়তেন আর তাঁদের মত বীর হবার কথা চিন্তা করতেন। এজন্য তিনি খুব চেষ্টাও করতে লাগলেন। তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিখতে আরম্ভ করলেন। ক্রমে অসিচালনা, অশ্বচালনা, মল্লক্রীড়া, শিকার—সকল বিষয়েই তিনি সবার সেরা হয়ে উঠলেন। আলেকজাণ্ডার দেখতেও ছিলেন সুপুরুষ। তাঁর রং ছিল খুব ফর্সা আর চুলগুলি ছিল কোঁকড়ান সোনালী রংয়ের। তাঁর চোখে-মুখে প্রতিভা ও শক্তি যেন ফুটে বেরোত। তাই তাঁকে যে দেখত সেই ভালবাসত।



আলেকজাণ্ডার

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আলেকজাণ্ডার সমস্ত পৃথিবী জয় করবার কল্পনায় মেতে উঠলেন। তিনি সঙ্কল্প করলেন যে, গ্রীক সভ্যতার বিস্তার করে তিনি ইউরোপ ও এশিয়ার মিলন ঘটাবেন। তাঁর বয়স যখন কুড়ি বছর, তখন একজন গুপ্ত ঘাতকের হাতে ফিলিপের মৃত্যু হয়। আলেকজাণ্ডার ম্যাসিডনের রাজা হলেন। এর দুবছর পরে বহুদিনের আশা সফল করতে

আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ইউরোপের সীমানা পার হয়ে তিনি প্রথমে এশিয়া মাইনরের কয়েকটি শহর অধিকার করলেন। তারপর ক্রমে সিরিয়া, টাইর, সাইড্‌ন, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি শহর ও রাজ্যগুলি একে একে তাঁর অধীন হল। পারস্য-সম্রাট তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে দুবার আলেকজাণ্ডারকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এই দুর্ধর্ষ গ্রীক বীরের কাছে দুবারই তাঁর পরাজয় হয়।

আলেকজাণ্ডার ক্রমে পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী পার্সিপোলিস দখল করলেন। দেড়শ' বছর আগে পারস্য-সম্রাট জার্কসিজ্‌ এথেন্স শহর পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাই আজ আলেকজাণ্ডারের আদেশে গ্রীকরা দারায়ুসের সুন্দর রাজপ্রাসাদটিতে আগুন লাগিয়ে তার প্রতিশোধ নিল।

পারস্য সাম্রাজ্য জয় করে আলেকজাণ্ডার ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। এর মধ্যে কতকগুলি রাজ্য রাজারা শাসন করতেন, অন্য রাজ্যগুলিতে কোন রাজা ছিল না। সে-সব জায়গায় দলপতিরা শাসনকার্য চালাতেন। আলেকজাণ্ডারের ভয়ে এঁরা অনেকেই বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করলেন। কেউ কেউ অবশ্য স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদেরও আলেকজাণ্ডারের অধীনতা স্বীকার করতে হল।

সিন্ধু ও ঝিলাম নদীর মধ্যে তক্ষশীলা নামে একটি রাজ্য ছিল। এর রাজধানীর নামও ছিল তক্ষশীলা। উপনিষদের যুগ থেকে এই শহরটি বিদ্যাচর্চার জন্য খ্যাতি লাভ করেছিল। এখানে একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সেখানে বেদ, বেদাঙ্গ, চিকিৎসাশাস্ত্র, ধনুর্বেদ প্রভৃতি শেখান হত। দেশ-বিদেশের বহু ছাত্র এখানে বিদ্যাশিক্ষা করতে আসত।

আলেকজাণ্ডার যখন পঞ্জাবে প্রবেশ করেন, তখন তক্ষশীলার রাজা ছিলেন অম্ভি। তিনি আলেকজাণ্ডারকে সৈন্যসামন্ত দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

অম্ভির প্রতিবেশী পুরু ছিলেন যেমন নির্ভীক তেমনি তেজস্বী। তিনি ঝিলাম ও চেনাব নদীর মধ্যে একটি ছোট রাজ্যে রাজত্ব করতেন। আলেকজাণ্ডার পুরুকে বশ্যতা স্বীকার করবার জন্য বলে পাঠালেন। কিন্তু পুরু ঘৃণার সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। গ্রীকদের বাধা দেবার জন্য তিনি তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে ঝিলাম নদীর পারে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে তাঁর তুমুল যুদ্ধ হয়।

পুরুর অনেকগুলি হাতী ছিল। সেগুলি দেখে গ্রীকরা প্রথমটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কারণ এর আগে তারা কখনও হাতীর সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই হাতীগুলির জন্যই পুরুর পরাজয় হল। গ্রীকরা চারদিক থেকে এই বড় বড় জন্তুগুলির উপর অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়তে আরম্ভ করল। হাতীগুলি ক্ষেপে গিয়ে শত্রু-মিত্র সকলকেই পিষে মারতে লাগল। এর ফলে পুরুর সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। পুরু নিজে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করলেন। অস্ত্রের আঘাতে জর্জরিত হয়ে তাঁর শরীর ক্রমে অবসন্ন হয়ে পড়ল। তখন গ্রীকরা তাঁকে বন্দী করে আলেকজাণ্ডারের কাছে নিয়ে গেল।

বন্দী হয়েও পুরু নিজের মর্যাদা ভোলেননি। আলেকজাণ্ডার যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বন্দী! তুমি আমার কাছে কি রকম ব্যবহার আশা কর?' নির্ভীক পুরু তখন সগর্বে উত্তর করলেন, 'রাজার মত।' আলেকজাণ্ডার তাঁর তেজস্বিতায় মুগ্ধ হলেন। তিনি তাঁকে মুক্তি

তো দিলেনই, তাঁর রাজ্যও তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। আলেকজাণ্ডার ছিলেন প্রকৃত বীর, তাই তিনি বীরের সম্মান দিতে জানতেন।

এর পরে আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন। নদীর ওপারেই ছিল মগধের নন্দবংশের রাজাদের বিশাল সাম্রাজ্য। আলেকজাণ্ডার জানতে পারলেন যে, নন্দরাজ এক বিরাট সৈন্যবাহিনী এবং বহু হাতী নিয়ে তাঁকে বাধা দেবার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্য আলেকজাণ্ডার উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। কিন্তু গ্রীক সৈন্যরা কিছুতেই আর এগিয়ে যেতে চাইল না। তারা অনেকদিন দেশ ছাড়া, সকলেই দেশে ফিরে যাবার জন্য অস্থির। তাছাড়া পুরুর মত ছোট রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে তাদের যে বিপদে পড়তে হয়েছিল সেইজন্যও তারা দমে গিয়েছিল। আলেকজাণ্ডার শত চেষ্টা করেও তাদের মত পরিবর্তন করাতে পারলেন না। কাজেই মগধ জয় করবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে তাঁকে ফিরে যেতে হল।

আলেকজাণ্ডার যে পথে এসেছিলেন সে পথে ফিরলেন না। ঝিলাম নদীর তীরে ফিরে এসে তিনি দক্ষিণ দিকে চলতে লাগলেন। পথে পঞ্জাবের কয়েকটি শক্তিশালী জাতি তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করল। তাদের সকলকেই পরাজিত করে তিনি ক্রমে সিন্ধু নদের মোহনার কাছে এসে পড়লেন। সেখান থেকে তিনি কিছু সৈন্য সমুদ্রপথে পারস্য উপসাগরের দিকে পাঠিয়ে দিলেন, আর বাকী সৈন্য নিয়ে নিজে বেলুচিস্থানের ভিতর দিয়ে পারস্য দেশে ফিরে এলেন। এর কিছুদিন পরে ব্যাবিলনে হঠাৎ কয়েক দিনের জ্বরে তাঁর মৃত্যু হয়। মিশর ও পশ্চিম এশিয়ার রাজ্যগুলি জয়ের পর সেখানে গ্রীক সভ্যতা বিস্তার করেই আলেকজাণ্ডার সবচেয়ে বেশী খ্যাতি লাভ করেছেন।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য গ্রীক সেনাপতিরা ভাগাভাগি করে নিলেন। এইভাবে মিশর ও পশ্চিম এশিয়াতে কয়েকটি গ্রীক রাজ্য স্থাপিত হল। এর পর গ্রীকদের মধ্যে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হয় এবং সেলিউকস নামে একজন গ্রীক সেনাপতি সমস্ত পশ্চিম এশিয়ায় নিজের আধিপত্য স্থাপন করেন।

আলেকজাণ্ডার যখন পঞ্জাবে যুদ্ধ করছিলেন তখন চন্দ্রগুপ্ত নামে একজন দুঃসাহসী ভারতীয় যুবক তাঁর শিবিরে আসেন। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি গ্রীকদের যুদ্ধ-কৌশল শিখবার জন্যই পঞ্জাবে এসেছিলেন এবং আলেকজাণ্ডারকে মগধ আক্রমণ করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন কারণে আলেকজাণ্ডার চন্দ্রগুপ্তের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে হত্যা করবার আদেশ দেন। চন্দ্রগুপ্ত পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। তারপর ঘুরতে ঘুরতে তিনি বিন্ধ্য পর্বতের কাছে এসে উপস্থিত হন। সেখানে কৌটিল্য নামে একজন অতি বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। কৌটিল্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করে মগধের সম্রাট হয়েছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ইতিহাসে মৌর্য বংশ বলে পরিচিত। অনেকে বলেন যে, নন্দবংশের একজন রাজার মুরা নামে এক দাসী ছিল ; চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন সেই দাসীর সন্তান। মায়ের নাম অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের বংশের নাম হয় মৌর্য। কিন্তু অনেকে আবার একথা মানেন না। তাঁরা বলেন, মৌর্য নামে একটি অতি প্রাচীন রাজবংশে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়েছিল। সেই বংশের নামানুসারে তাঁর বংশকেও মৌর্য বংশ বলা হত।

চন্দ্রগুপ্ত প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করেছিলেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর পঞ্জাবে ভীষণ গণ্ডগোল শুরু হয়। সেই সুযোগে গ্রীকদের তাড়িয়ে দিয়ে চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাব এবং সিন্ধু দেশ নিজের অধীনে আনেন।

তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে সেলিউকস আবার পাঞ্জাব জয় করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। সেলিউকস তাঁকে পঞ্জাবের রাজা বলে স্বীকার তো করলেনই, তা ছাড়া আফগানিস্থান এবং বেলুচিস্থানের কয়েকটি প্রদেশও তাঁকে ছেড়ে দিলেন। এইভাবে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য ভারতের বাইরেও বিস্তৃত হয়েছিল।

যুদ্ধের পরে চন্দ্রগুপ্ত ও সেলিউকসের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। তাছাড়া সেলিউকস চন্দ্রগুপ্তের সভায় একজন গ্রীক দূত পাঠিয়েছিলেন। তাঁর নাম মেগাস্থিনিস্। তিনি অনেকদিন চন্দ্রগুপ্তের সভায় ছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি একখানি বই লিখেছিলেন। তা থেকে চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

মৌর্যদের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্রে। পাটনার কাছে কুমরাহার নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে মৌর্যদের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ মাটি খুঁড়ে বার করা হয়েছে। মেগাস্থিনিসের বিবরণী থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই শহরটি প্রায় ন' মাইল লম্বা আর দেড় মাইল চওড়া ছিল। নগর রক্ষার জন্য এর চারদিকে একটি কাঠের প্রাচীর ছিল, এবং তার বাইরে ছিল একটি গভীর পরিখা। চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদটিও ছিল কাঠের তৈরী, কিন্তু এর কারুকার্য এত সুন্দর ছিল যে পারসিক সম্রাটদের রাজপ্রসাদগুলিও তার কাছে হার মেনে যেত।

চন্দ্রগুপ্তের শাসন-ব্যাবস্থাও খুব ভাল ছিল। তিনি প্রতিনিধিদের সাহায্যে দেশ শাসন করতেন। এখন যেমন ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে, তেমনি চন্দ্রগুপ্তও শাসন-কার্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সৃষ্টি করেছিলেন। পাটলিপুত্রের শাসন ভার ছিল একটি নগর-সভার উপর। এই সভার সদস্যরা জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখতেন, বিদেশীদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করতেন, এবং শহরে কেনা-বেচার তত্ত্বাবধান করতেন।

চন্দ্রগুপ্ত তাঁর বিস্তৃত সাম্রাজ্য রক্ষা করবার জন্য একটি বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন। এই সেনাবাহিনীতে ছয় লক্ষ পদাতিক সৈন্য, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, এবং বহু হাতী, রথ ও রণতরী ছিল। সৈন্যবিভাগের কাজকর্ম দেখবার ভারও একটি সভার উপর দেওয়া হয়েছিল।

চন্দ্রগুপ্ত কৌটিল্যকেই তাঁর প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন। রাজ্য-শাসন কি ভাবে করা উচিত সে-সম্বন্ধে কৌটিল্য একখানি গ্রন্থ রচনা করে-ছিলেন। গ্রন্থখানির নাম "অর্থশাস্ত্র"। মেগাস্থিনিসের বিবরণের মত এই গ্রন্থখানি থেকেও আমরা চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে জানতে পারি।

কালক্রম

খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৬—আলেকজাণ্ডারের সিংহাসন লাভ।
৩৩১—পারস্য সাম্রাজ্যের পতন।
৩২৭-৩২৫—আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান।
আঃ ৩২৪—মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
৩২৩—আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু।
আঃ ৩০৫—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সহিত সেলিউকসের যুদ্ধ।
আঃ ২৯৮—চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু।

প্রশ্ন

১। আলেকজাণ্ডার কোথাকার রাজা ছিলেন? তিনি কেন ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেছেন?

২। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্যের কি অবস্থা হয়েছিল?

৩। আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এ রকম একজন ভারতীয় রাজার নাম কর।

৪। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কে করেছিলেন? তাঁর সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল? গ্রীকদের সঙ্গে তাঁর কি রকম সম্পর্ক ছিল?

৫। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজ্যশাসনপ্রণালী বর্ণনা কর। কোন্ কোন্ পুস্তক থেকে এ সম্বন্ধে জানা যায়?

একাদশ অধ্যায়
প্রিয়দর্শী অশোক

চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার মগধের রাজা হন। বিন্দুসারের পর রাজা হন তাঁর পুত্র অশোক। ভারতবর্ষের রাজাদের মধ্যে অশোকের স্থান সকলের উপরে।

অশোকের সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, বিন্দুসারের একশ' ছেলে ছিল। সিংহাসন লাভের জন্য অশোক ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাঁদের পরাজিত করে তিনি রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু এ কাহিনী অনেকে বিশ্বাস করেন না।

অশোকের অনেকগুলি শিলালিপি পাওয়া গেছে। সেগুলি থেকেই আমরা তাঁর রাজত্বের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারি। প্রথম জীবনে অশোক মগধের অন্যান্য রাজাদের মত আমোদ-প্রমোদ, মৃগয়া ও যুদ্ধবিগ্রহ ভালবাসতেন। রাজা হয়ে তিনি তাঁদের মতই রাজ্যবিস্তার করতে চেষ্টা করেন। সে-সময়ে এখনকার উড়িষ্যা ও অন্ধ্রদেশের কিছুটা জুড়ে কলিঙ্গ নামে একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। রাজা হবার বারো বছর পরে অশোক বহু সৈন্যসামন্ত নিয়ে এই রাজ্যটি আক্রমণ করলেন। কলিঙ্গবাসীদের সঙ্গে তাঁর তুমুল যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য নিহত ও বন্দী হয়েছিল। এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড এবং কলিঙ্গ-



অশোক

বাসীদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে অশোকের মন গভীর বেদনায় পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তিনি খুবই অনুতপ্ত হন। তাই তিনি যুদ্ধ করে নতুন রাজ্য জয় করবার ইচ্ছা মন থেকে একেবারে মুছে ফেললেন। প্রতিবেশী রাজ্যের অধিবাসীদের তিনি আশ্বাস দিলেন যে, তাঁর কাছ থেকে তাদের কোন ভয় নেই। তারা যাতে নিরুদ্বেগে সুখে শান্তিতে বাস করতে পারে তাই তিনি চান।

কলিঙ্গ যুদ্ধের ফলে অশোকের জীবনের ধারাই বদলে গিয়েছিল। এর অল্পকাল পরে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন থেকে তিনি সমস্ত ভোগ-বিলাস ও আমোদ-প্রমোদ ছেড়ে দিলেন, মৃগয়ায় যাওয়া বন্ধ করলেন, আর রাজপ্রাসাদের মধ্যে পশুহত্যা নিষিদ্ধ করে দিলেন। নিজের জীবন তিনি এমনভাবে গড়ে তুললেন যাতে সকলের কাছ থেকে তিনি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেতে পারেন।

প্রজাদের মনে যাতে ধর্মভাব জেগে ওঠে, আর সকলে যাতে সুখে শান্তিতে থাকতে পারে এখন থেকে তাই হল অশোকের একমাত্র চিন্তা। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে সকলকে বুদ্ধদেবের অহিংসা ও শান্তির বাণী শোনাতে লাগলেন।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর জীবনের আদর্শ সফল করতে হলে আরও অন্য লোকের সাহায্য প্রয়োজন। তাই তিনি বড় বড় রাজকর্মচারীদের আদেশ দিলেন তাঁরাও যেন নিজেদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে লোকদের ধর্মোপদেশ দেন। যাতে সব সময়ই তাঁর ধর্মোপদেশগুলি লোকের চোখে পড়ে, সেইজন্য তিনি তাঁর বিশাল রাজ্যের জায়গায় জায়গায়, পাহাড়ের গায়ে আর পাথরের থামের উপর সেগুলি খোদাই করে দেবার ব্যবস্থা করলেন। তিনি এই সব লিপির নাম

দিয়েছিলেন 'ধর্মলিপি'। এছাড়া তিনি 'ধর্মমহাপাত্র' নামে এক বিশেষ শ্রেণীর রাজকর্মচারী নিযুক্ত করলেন। এঁরা প্রজাদের ধর্মকথা শোনাতেন আর তারা যাতে সৎপথে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন।

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেও অশোক কোনরকম গোঁড়ামি পছন্দ করতেন না। তিনি সকল ধর্মের লোকদের শ্রদ্ধা করতেন, এবং সকলের প্রতি সমান অনুগ্রহ দেখাতেন। তিনি বলতেন যে, কখনও নিজের ধর্মের প্রশংসা ও অন্য ধর্মের নিন্দা করা উচিত নয়। পরস্পরের ধর্মমত শুনে তার সার গ্রহণ করাই সকলের কর্তব্য। অশোকের উপদেশগুলি যেমন সরল তেমনি মহান্। তাঁর প্রধান প্রধান ধর্মোপদেশগুলি ছিল এই রকম—পিতামাতা ও গুরুজনদের শ্রদ্ধা করবে; ব্রাহ্মণ, শ্রমণ সকলকে ভক্তি করবে; আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, দাস-দাসী সকলের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে; জীবজন্তুদের কোনরূপ হিংসা করবে না; সর্বদা সত্য কথা বলবে; পবিত্র জীবন যাপন করবে; দয়া, কৃতজ্ঞতা, সংযম প্রভৃতি সদ্‌গুণের অনুশীলন করবে।

সৈন্যবলে অন্য দেশ জয় করার বদলে অশোক এখন ধর্মবলে দেশ জয় করার দিকে মন দিলেন। অন্য রাজ্য জয় করতে আগে যেখানে পাঠাতেন সৈন্য, এখন তিনি সেখানে পাঠাতে লাগলেন ধর্মপ্রচারক। এই রকম করে রাজ্য জয় করাকে অশোক বলতেন 'ধর্মবিজয়'।

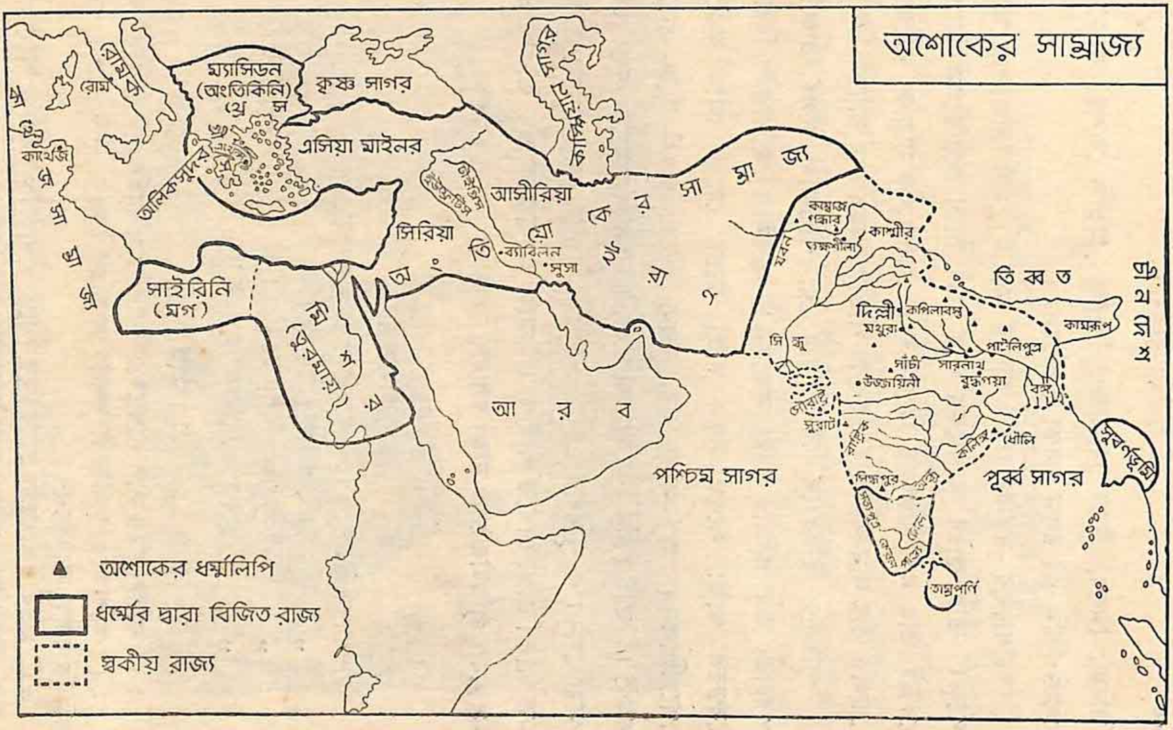
দক্ষিণ ভারতে তখন চোল, পাণ্ড্য, কেরল ও সত্যপুত্র নামে চারটি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য ছিল। অশোকের দূতেরা এই সকল রাজ্যে ধর্ম প্রচার করেছিল। এছাড়া ভারতের বাইরে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, পশ্চিম এশিয়া, মিশর ও গ্রীস দেশেও অশোক ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। শোনা যায় যে, এইজন্য নিজের পুত্র (কেউ কেউ

বলেন ভাই) মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে সিংহলে পাঠান। এই রকম ভাবে অশোক পৃথিবীর একমাত্র 'ধর্মবিজয়ী' সম্রাট হয়েছিলেন।

মানুষ ও সাধারণ জীবজন্তুর দুঃখ-কষ্ট দূর করবার জন্য অশোকের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। রাজকর্মচারীদের উদ্দেশ করে তিনি এক জায়গায় বলেছেন, "সকল মানুষই আমার সন্তানের মত। আমার নিজের সন্তানের মতই আমি তাদের মঙ্গল কামনা করি। রাজ-কর্মচারীরা যেন একথা সর্বদা মনে রেখে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করেন।"


অশোক স্তম্ভ

প্রজাদের উপর যাতে কোন রকম অন্যায় অবিচার না হয় তা দেখবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে একদল ধীর, স্থির ও শান্ত স্বভাবের কর্মচারী গ্রামে ও নগরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। অপরাধীদের প্রতি যে সমস্ত কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা ছিল তিনি তা কমিয়ে দেন। অযথা জীবহত্যাও তিনি বন্ধ করে দিলেন। যাতায়াতের সুবিধার জন্য তিনি বড় বড় রাস্তা তৈরী করিয়ে তার পাশে পাশে গাছ লাগাবার ব্যবস্থা করেন যাতে কেউ রৌদ্রে কষ্ট না পায়; রাস্তার মধ্যে মধ্যে তিনি কূপও খনন করিয়ে দেন যাতে তৃষ্ণার সময়ে কারো জলের অভাব না হয়। এছাড়া তিনি মানুষ ও পশুর চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। যাতে ওষুধের অভাব না হয় সেজন্য নানা রকম ওষুধের লতা ও গুল্ম রোপণ করিয়েছিলেন। এসব কেবল নিজের দেশেই করেন নি।


অশোকের সাম্রাজ্য
ম্যাসিডন
(অংতিকিনি)
কৃষ্ণ সাগর
এসিয়া মাইনর
আসীরিয়া
সিরিয়া
ব্যাবিলন
সুসা
সাইরিনি
(মগ)
আ র ব
পশ্চিম সাগর
পূর্ব্ব সাগর
তি ব্ব ত
চী ন দে শ
কাশ্মীর
দিল্লী
কপিলাবস্তু
মথুরা
পাটলিপুত্র
সাঁচী
সারনাথ
উজ্জয়িনী
বুদ্ধগয়া
কামরূপ
সুরাট
ধৌলি
তাম্রপর্ণি
রোম
কার্থেজ
অশোকের ধর্ম্মলিপি
ধর্ম্মের দ্বারা বিজিত রাজ্য
স্বকীয় রাজ্য

সিরিয়া, মিশর, উত্তর আফ্রিকা, সিংহল প্রভৃতি দেশের লোকদের জন্যও তিনি এই রকম ব্যবস্থা করেছিলেন।

অশোকের মৃত্যুর অল্প কালের মধ্যেই মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। তার কারণ অশোকের পরে যাঁরা রাজা হয়েছিলেন তাঁদের কেউই তাঁর মত শক্তিমান ছিলেন না। অশোকের সাম্রাজ্য নষ্ট হয়ে গেলেও তাঁর নাম আজও ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, শক্তিমান হলেই রাজারা পররাজ্য জয় করবার চেষ্টা করতেন। একমাত্র অশোকই বিরাট সৈন্যবল থাকা সত্ত্বেও নতুন রাজ্য জয়ের লোভ ত্যাগ করতে পেরেছিলেন। শুধু মানুষ নয়, সকল জীবের দুঃখই তাঁর প্রাণে বাজত। তাই তিনি জগতের সমস্ত প্রাণীর কল্যাণ বিধানের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসে আমরা অশোকের মত আদর্শ রাজা দেখতে পাই না। তাই অশোককে শুধু ভারতবর্ষের নয় সমস্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা বললেও অত্যুক্তি করা হয় না।

কালক্রম

আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২৭২—অশোকের সিংহাসন আরোহণ।
" খ্রীঃ পূঃ ২৬০—কলিঙ্গের যুদ্ধ।
" খ্রীঃ পূঃ ২৩২—অশোকের মৃত্যু।
" খ্রীঃ পূঃ ৮৭—মৌর্য বংশের পতন।

প্রশ্ন

১। কলিঙ্গ-যুদ্ধের ফলে অশোকের জীবনে কি পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল?

২। অশোককে 'ধর্মবিজয়ী সম্রাট' বলা হয় কেন? ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি কি ব্যবস্থা করেছিলেন?

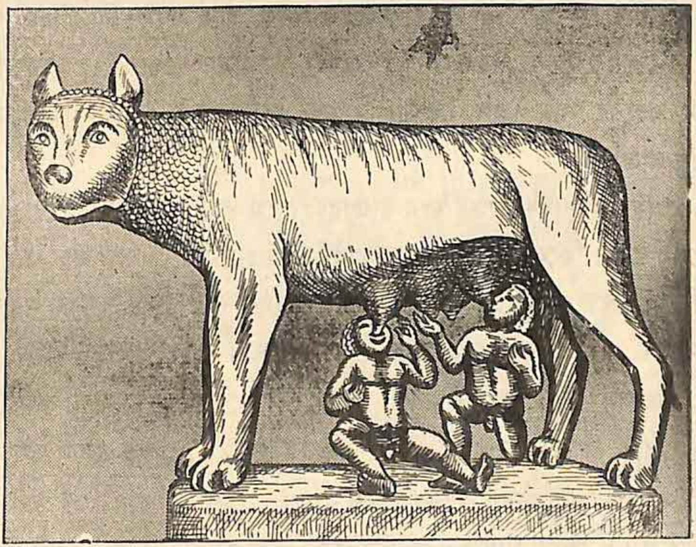
৩। মানুষ ও জীবজন্তুর দুঃখকষ্ট দূর করতে অশোক কি ব্যবস্থা করেছিলেন?

৪। পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে অশোকের স্থান নির্দেশ কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

রোমের কাহিনী ঃ হ্যানিবলের সহিত যুদ্ধ

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ইটালী দেশের টাইবার নদীর তীরে একটি ছোট শহরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এর নাম দেওয়া হয়েছিল রোম। সেখানে যারা বাস করত তারা স্পার্টানদের মত বীর ছিল আর এথেন্সের লোকদের মত লেখাপড়া ও শিল্পের কাজ ভালবাসত। সভ্য জাতি হিসাবে সে যুগে এরাও খুব উন্নতি করেছিল।



শিশু রোমুলাস ও রিমাস

রোম শহরের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। এক রাজকন্যার রোমুলাস আর রিমাস নামে দুটি যমজ ছেলে হয়।

এদের মেরে ফেলবার জন্য এক দুষ্ট রাজা ডোঙায় করে দুই ভাইকে টাইবার নদীর জলে ভাসিয়ে দেন। তারা কিন্তু মরল না। একটি নেকড়ে বাঘিনী সেই ডোঙা থেকে তাদের উদ্ধার করল। বাচ্চা দুটির উপর তার কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল। সে নিজের দুধ খাইয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখে। একদিন এক রাখাল লুকিয়ে শিশু দুটিকে বাড়িতে নিয়ে আসে। সেই রাখালের ঘরেই তারা বড় হতে থাকে। অনেকদিন পরে তারা নিজেদের আসল পরিচয় জানতে পারল। তখন তারা সেই দুষ্ট রাজাকে মেরে ফেলল। এবার দুভাই একটি শহর নির্মাণ করবে বলে স্থির করল। শহরের পত্তনও হল, কিন্তু কার নামে শহরের নাম হবে তাই নিয়ে দুজনের ঝগড়া বেধে গেল। একজন দৈবজ্ঞের কথামত শেষে রোমুলাসের নামে শহরের নাম হল রোম। এই রোমুলাসই ছিলেন রোমের প্রথম রাজা।

প্রায় আড়াইশ' বছর ধরে রাজারা রোমে রাজত্ব করেন। রোমের সর্বশেষ রাজা ছিলেন ভয়ানক অহঙ্কারী ও অত্যাচারী। সেইজন্য তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে রোমের গণ্যমান্য লোকেরা নিজেরাই রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। এঁদের একটি সভা ছিল, তার নাম ছিল "সেনেট"।

রাজপদ উঠে যাবার পর অনেকদিন কেবল রোমের গণ্যমান্য লোকেরাই রাজ্যের সুখ-সুবিধা ভোগ করতেন। এতে ক্রমে তাঁদের সঙ্গে সাধারণ লোকদের ঝগড়া বেধে যায়। বহুকাল ধরে এই ঝগড়া চলেছিল। শেষে সাধারণ লোকেরাও রাজ্যশাসন করবার অধিকার পেল।

রোমবাসীরা ক্রমে তাদের রাজ্য বাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। সে সময়ে ইটালীতে আরও অনেক জাতি বাস করত। রোমানরা

একে একে তাদের জয় করতে লাগল। তখন থেকে দু'শ' বছর পর্যন্ত একটা না একটা জাতির সঙ্গে রোমানদের যুদ্ধ লেগেই থাকত। ক্রমে সমস্ত ইটালী দেশ রোমানদের অধিকারে আসে।

ফিনিসীয়রা উত্তর আফ্রিকায় কার্থেজ নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেছিল, সে কথা আমরা আগেই বলেছি। এই সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে কার্থেজের অধিবাসীরা খুব ধনী হয়ে উঠেছিল। তাদের অনেকগুলি বাণিজ্য-জাহাজ আর রণতরী ছিল। এই রণতরীগুলি ছিল খুব বড় বড়। উপর থেকে নীচে প্রত্যেক দিকে পর পর পাঁচ সারি দাঁড় বেয়ে এগুলিকে চালান হত। ভূমধ্য সাগরের পশ্চিম ভাগে তখন কার্থেজবাসীরাই কর্তৃত্ব করত। সেখানকার ছোট ছোট দ্বীপগুলি তাদের অধীনে ছিল। ইটালীর দক্ষিণে যে সিসিলি দ্বীপটি আছে তারও বেশীর ভাগ ছিল কার্থেজের দখলে। রোমের ক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে দেখে কার্থেজবাসীরা আর সহ্য করতে পারল না। শেষে তাদের সাথে রোমানদের যুদ্ধ বেধে গেল। এই যুদ্ধের নাম পিউনিক যুদ্ধ। কারণ ল্যাটিন ভাষায় ফিনিসীয়দের বলা হত 'পিউনিকান'।

রোমানদের সঙ্গে কার্থেজবাসীদের তিনটি বড় বড় যুদ্ধ হয়েছিল। প্রথম যুদ্ধে কার্থেজবাসীরা হেরে গেল এবং সিসিলি ও অন্য দ্বীপগুলি রোমানদের দখলে এল। এরপর প্রায় কুড়ি বছর শান্তিতে কাটল। কিন্তু হ্যামিলকার বার্কা নামে কার্থেজের একজন সেনাপতি নিজের দেশের শোচনীয় পরাজয়ের কথা ভুলতে পারলেন না। তিনি স্পেন জয় করে সেখান থেকে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন। হ্যামিলকার স্পেনে যাবেন, তাঁর ন' বছরের ছেলে হ্যানিবল বায়না ধরল যে তাকেও সঙ্গে নিতে হবে। ন' বছরের বালক যুদ্ধে যাবে কি! হ্যামিলকার প্রথমটা রাজী হলেন না। তারপর হ্যানিবলের

মুখের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবলেন ; বললেন, "তোমাকে নিয়ে যেতে পারি যদি তুমি শপথ কর যে চিরকাল রোমের শত্রুতা করবে।" বীর বালক বিনা দ্বিধায় সে শপথ গ্রহণ করল। এই হ্যানিবলই একদিন দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের মত পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি হতে পেরেছিলেন।

পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পরে হ্যানিবল কার্থেজের সেনাবাহিনীর ভার পেলেন। তখন এদের নিয়ে তিনি রোম জয়ের জন্য যাত্রা করেন। প্রথম পিউনিক যুদ্ধে রোমানরা কার্থেজের জাহাজগুলি ধ্বংস করে দিয়েছিল। তাই হ্যানিবল আল্পস পর্বত পার হয়ে ইটালীতে যাওয়া স্থির করলেন। এরকম দুঃসাহসের কাজ সেকালে কেউ কল্পনাও করতে পারত না। হ্যানিবলকে এজন্য খুবই কষ্ট সহ্য করতে হল। বরফে ঢাকা আল্পস পর্বত পার হবার সময়ে তাঁর অর্ধেক সৈন্য মারা গেল। কিন্তু তিনি এসব কিছুই গ্রাহের মধ্যে আনলেন না। পিতার কাছে তিনি যে শপথ করেছিলেন তা তাঁকে সফল করতেই হবে—এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা।

এদিকে হ্যানিবল আল্পস পর্বত পার হয়েছেন জানতে পেরে রোমানরা তাঁকে বাধা দেবার জন্য সৈন্য পাঠাল। কিন্তু তাঁর সৈন্যদের সামনে রোমানরা দাঁড়াতে পারল না। এরপর আরও কয়েকটি বড় বড় যুদ্ধ হল। হ্যানিবল তাঁর অদ্ভুত রণকৌশলের জন্য প্রত্যেকটি যুদ্ধেই জয়লাভ করলেন।

একবার হ্যানিবল বড় বিপদে পড়েছিলেন। সৈন্যদের নিয়ে তিনি এক পাহাড়ের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেন। সুযোগ পেয়ে শত্রুরা তাঁকে ঘিরে ধরল। চারদিকে শত্রুসৈন্য, বেরুবার কোন পথ নেই। হ্যানিবল তখন এক মজার ফন্দী আঁটলেন। তিনি কতকগুলি



হ্যানিবলের শপথ গ্রহণ

গরু জোগাড় করতে বললেন। সন্ধ্যার সময়ে তাদের শিং-এ মশাল বেঁধে সেগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হল। তারপর পেছন থেকে গরুগুলিকে তাড়া দেওয়া হল। গরুগুলি প্রাণভয়ে দৌড়তে লাগল, আর



রোমানরা ভাবল কার্থেজিয়ান সৈন্যরা বুঝি রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যাচ্ছে। তাই গরুগুলি যেদিকে যাচ্ছিল তারাও সে দিকে ছুটে গেল। সেই ফাঁকে হ্যানিবল নিজের সৈন্যদের নিয়ে অন্য এক পথ দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

ক্রমাগত পনের বছর ধরে যুদ্ধ করে হ্যানিবল ইটালীর প্রায় সমস্তটা জয় করেছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই রোম অধিকার করতে পারলেন না। রোমানরা মরিয়া হয়ে রোম রক্ষা করতে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইটালীর অন্যান্য জায়গাতেও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকল।

এদিকে ইটালীর বাইরেও রোমের সঙ্গে কার্থেজের যুদ্ধ চলছিল। এই সব যুদ্ধে রোমানরাই জয়লাভ করতে থাকে। অবশেষে সিপিও নামে একজন বড় রোমান সেনাপতি সমুদ্র পার হয়ে কার্থেজ আক্রমণ করলেন। কার্থেজবাসীরা তখন বিপদে পড়ে হ্যানিবলকে দেশে ফিরে আসতে বলল। তিনি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ইটালী থেকে তাঁর সৈন্যদের নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। সেখানে সিপিওর সঙ্গে তাঁর ভীষণ যুদ্ধ হল। এই যুদ্ধে হ্যানিবলই হেরে গেলেন। জীবনে তিনি এই একবার মাত্র পরাজিত হয়েছিলেন। আনন্দে রোমানরা সিপিওকে "আফ্রিকেনাস" অর্থাৎ "আফ্রিকাবিজয়ী" উপাধি দিল।

কার্থেজবাসীরা এবার বাধ্য হয়ে রোমের সঙ্গে সন্ধি করল। তারা স্পেন দেশটি রোমানদের ছেড়ে দিল, আর তা ছাড়া যুদ্ধের ক্ষতিপূরণও দিল অনেক। কিন্তু রোমানরা এতেও সন্তুষ্ট হল না। কিছুদিন পরে তারা আবার দাবি করল যে, হ্যানিবলকেও তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। কিন্তু হ্যানিবল দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে সিরিয়ার রাজার কাছে আশ্রয় নিলেন। এখানে এসেও তিনি রোমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন ; ফলে সিরিয়ার সঙ্গে রোমের যুদ্ধ লাগে। সিরিয়ার রাজা যুদ্ধে হেরে গিয়ে হ্যানিবলকে রোমানদের হাতে তুলে দিতে স্বীকার করলেন। হ্যানিবল ব্যাপারটি জানতে পেরে আত্মহত্যা করে অপমান এড়ালেন। এত বড় বীরের এই রকম পরিণতির কথা ভাবলে কার না দুঃখ হয় !

স্পেন হারাবার পর কার্থেজের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারা আবার একটু একটু করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে থাকে। তাই দেখে রোমানদের মনে ঈর্ষা ও ভয় জাগে। কেটো নামে রোমানদের এক নেতা সেনেটে প্রত্যেক

বক্তৃতার শেষে জোর দিয়ে বলতেন, "কার্থেজ ধ্বংস করতেই হবে।" অবশেষে রোমানরা কার্থেজবাসীদের শহর ছেড়ে চলে যেতে বলল। কার্থেজবাসীরা এতে রাজী হতে পারল না। তাই প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে আবার দুপক্ষে যুদ্ধ বাধল।

এবার রোমানরা এসে চারদিক থেকে কার্থেজ ঘেরাও করল যাতে বাইরে থেকে কোন খাবার বা সাহায্য নগরের ভিতর না যেতে



কার্থেজিয়ান্ সৈন্য



রোমান সৈন্য

পারে। কার্থেজবাসীরাও জীবনপণ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। দুর্গগুলি মেরামত করা হল আর বাড়ীতে বাড়ীতে এমন কি দেবমন্দিরগুলিতেও অস্ত্রশস্ত্র তৈরী হতে লাগল। কেবল পুরুষ নয়, কার্থেজের নারীরাও একাজে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে এগিয়ে এল। যুদ্ধের খরচ যোগাবার জন্য তারা গা থেকে গহনা খুলে দিল,

আর মাথার চুল কেটে দিল ধনুকের গুণ তৈরী করবার জন্য। কিন্তু এত করেও কার্থেজ রক্ষা করা গেল না। রোমানরা প্রাচীর ভেঙে শহরে ঢুকে পড়ল এবং সমস্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিল। পঞ্চাশ হাজার কার্থেজবাসীকে তারা বন্দী করে নিয়ে গেল। ধনসম্পদে পূর্ণ প্রাচীন কার্থেজ নগরী এই ভাবেই পৃথিবীর বুক থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

এরপরে রোমানদের আর কোন ভয় রইল না। তারা নতুন নতুন রাজ্য জয় করে ভূমধ্যসাগরের আশপাশের সমস্ত অঞ্চল-গুলির উপর নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করল এবং ক্রমে আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকল।

কালক্রম

খ্রীঃ পূঃ ২৬৪—২৪১ প্রথম পিউনিক যুদ্ধ।
খ্রীঃ পূঃ ২১৮—২০২ দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ।
খ্রীঃ পূঃ ১৪৯—১৪৩ তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ।

প্রশ্ন

১। রোমের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কিরূপ গল্প আছে বল।

২। হ্যানিবল কে ছিলেন? রোমানদের সঙ্গে হ্যানিবলের কেন যুদ্ধ হয়েছিল? এই যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল?

৩। 'আফ্রিকেনাস' উপাধি কাকে দেওয়া হয়েছিল? কেন তাঁকে এই উপাধি দেওয়া হয়?

৪। কি ভাবে প্রাচীন কার্থেজ শহর পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়েছিল?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

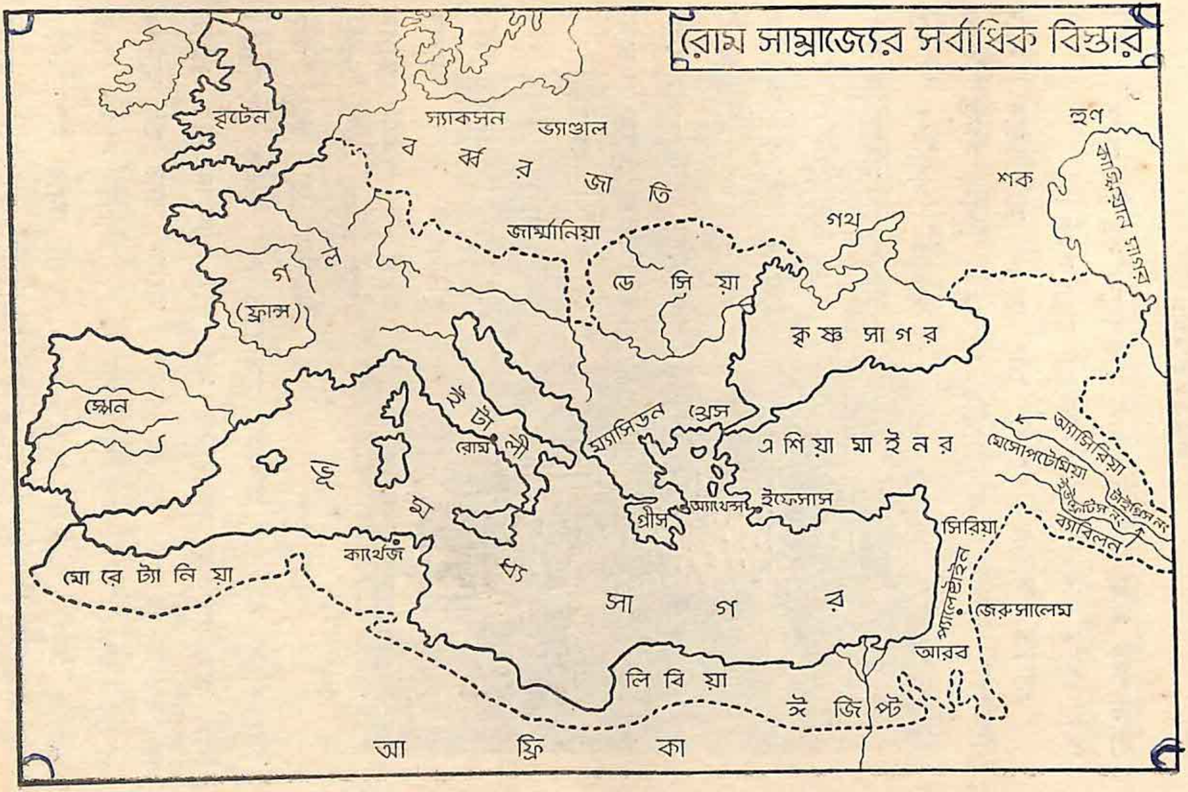
রোমান সাম্রাজ্যের জীবনযাত্রা

রোমানদের চরম উন্নতির দিনে তাদের সাম্রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। স্পেন এবং ইটালী ছাড়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স, গ্রীস, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশগুলিও তারা নিজেদের অধীনে আনে। কিন্তু সাম্রাজ্যের সীমা বাড়লে কি হবে, রোমের সাধারণ লোকদের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে পড়তে লাগল। কারণ যাঁরা দেশ শাসন করতেন তাঁরা কেবল নিজেদেরই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখতেন। অন্য লোকের দুঃখকষ্টের দিকে তাঁদের কোন নজর ছিল না। ক্রমে সাধারণ লোকদের মধ্যে অসন্তোষের ফলে গৃহবিবাদ আরম্ভ হল এবং রোমের শাসন-ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ল।



জুলিয়াস সীজার

এই সময়ে রোমে পর পর কয়েকজন বিশেষ শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব হয়। এঁদের বলা হত "ডিক্টেটর"। এঁরা সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে খুশিমত রাজ্য শাসন করতেন। ডিক্টেটরদের মধ্যে জুলিয়াস সীজার ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত। তিনি ছিলেন খুব বড় একজন যোদ্ধা। দেশের শাসন-ভার হাতে নিয়ে তিনি শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। শুধু তাই নয়, তিনি অনেক ভাল ভাল কাজও করেছিলেন। এইজন্য তিনি খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। সীজার ক্রমে সিংহাসন ও রাজদণ্ড ব্যবহার করতে শুরু করলেন। অনেকে মনে করল তিনি রাজা হবার চেষ্টা করছেন।


রোম সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তার
বৃটেন
স্যাকসন
ভ্যাণ্ডাল
ব র্ব্ব র জা তি
হুণ
শক
কাস্পিয়ান সাগর
গথ
জার্ম্মানিয়া
ডে সি য়া
গ ল
(ফ্রান্স)
কৃ ষ্ণ সা গ র
স্পেন
ইটালী
রোম
ম্যাসিডন
থ্রেস
এ শি য়া মা ই ন র
অ্যাসিরিয়া
মেসোপটেমিয়া
টাইগ্রিস নঃ
ইউফ্রেটিস নঃ
ব্যাবিলন
ভূ ম ধ্য সা গ র
গ্রীস
অ্যাথেন্স
ইফেসাস
সিরিয়া
প্যালেষ্টাইন
জেরুসালেম
আরব
কার্থেজ
মো রে ট্যা নি য়া
লি বি য়া
ঈ জি প্ট
আ ফ্রি কা

রোমানদের মধ্যে একদল লোক রাজপদকে বড় ঘৃণা করত তাই তারা ষড়যন্ত্র করে শেষ পর্যন্ত সীজারকে হত্যা করল।

এরপরে আবার গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। অক্টেভিয়ান নামে সীজারের একজন নিকট-আত্মীয় ছিলেন। তিনি সমস্ত বিপক্ষ দলকে পরাজিত করে সীজারের মতই সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন। রোমের সেনেট তাঁকে অগাষ্টাস অর্থাৎ "মহামহিমান্বিত" উপাধি দেয়, এবং সেই সময় থেকে রোমে "সম্রাট-দের যুগ" আরম্ভ হয়।

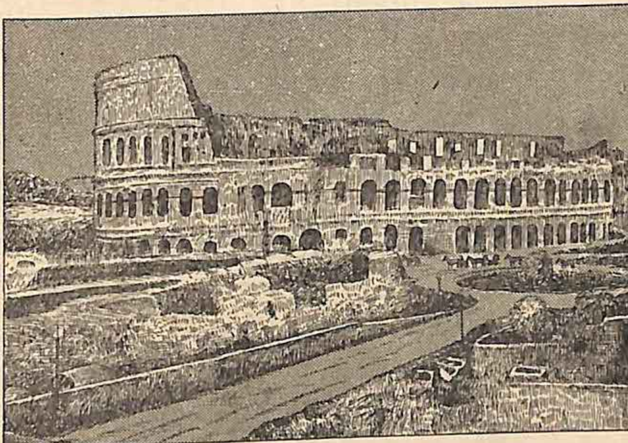


অক্টেভিয়ান

সম্রাট অগাষ্টাস সুশাসক ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের মধ্যে আবার শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তা ছাড়া তাঁর রাজত্বকালে সাহিত্য, স্থাপত্য প্রভৃতিরও খুব উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু সব সম্রাটই অগাষ্টাসের মত ভাল ছিলেন না। সম্রাট ক্যালিগুলা ছিলেন ভয়ানক নিষ্ঠুর, অনেক সময় শুধু আনন্দ পাবার জন্য তিনি নরহত্যা করতেন। নীরো নামে আর একজন সম্রাট ছিলেন অত্যন্ত খামখেয়ালী আর অত্যাচারী। তাঁর রাজত্বকালে একবার রোমে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়; সেই জ্বলন্ত

রোম শহরের দিকে চেয়ে নীরো নাকি আনন্দে বীণা বাজাতে থাকেন। এরপরে কয়েকজন ভাল সম্রাট রাজত্ব করেন। তাঁদের মধ্যে মার্কাস অরেলিয়াস দার্শনিক বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

সম্রাটেরা প্রায় সকলেই খুব জাঁকজমক ভালবাসতেন। তাঁদের আদেশে রোমে সুন্দর সুন্দর শ্বেত পাথরের দালান-কোঠা, বিজয়-



কলোসিয়াম

স্তম্ভ ও তোরণ, বড় বড় স্নানাগার, "ফোরাম", "কলোসিয়াম", প্রভৃতি তৈরী হয়েছিল। ফোরামে লোকেরা সভাসমিতি ও অন্যান্য কাজকর্মের জন্য জমা হত। এর চারদিকে সুন্দর সুন্দর দেবমন্দির, বিচারালয় প্রভৃতি ছিল। কলোসিয়ামে বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্রজন্তুর সঙ্গে মানুষের লড়াই দেখান হত। বিদেশ থেকে যারা আসত তারা রোমের আড়ম্বর দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে যেত।

এই সময়ে সাম্রাজ্যের অন্য জায়গায়ও রোমের অনুকরণে অনেক

শহর গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ধনসম্পদে ও সৌন্দর্যে রোমই ছিল সবার সেরা। রোমে নাগরিকদের খাওয়া-পরার কোন ভাবনা ছিল না। দেশ-বিদেশ থেকে তাদের জন্য অনেক সোনারূপা, সৌখীন পোশাক-পরিচ্ছদ, নানারকম তৈজসপত্র, জলপাইয়ের তেল, যব প্রভৃতি আসত।



কলোসিয়ামের লড়াই

নাগরিকদের জন্য প্রচুর আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা ছিল। সরকারী খরচে তাদের থিয়েটার, সার্কাস এবং কলোসিয়ামের লড়াই দেখান হত।

রোমে তখন বহু লোক বাস করত কিন্তু তাদের মধ্যে জমকাল পোশাক-পরিচ্ছদ পরা রাজকর্মচারী, অস্ত্রশস্ত্রধারী সৈনিক আর নানা কাজে ব্যস্ত দাসদেরই বেশী করে চোখে পড়ত। চাষবাস, খনি কাজ, জাহাজের দাঁড় টানা, বড় বড় বাড়ী এবং রাস্তাঘাট তৈরী সবই দাসেরা করত।

রোমের ভাল ভাল সম্রাটেরা দেশ রক্ষার সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। সুশাসনের জন্য তাঁরা অনেক আইন-কানুনও প্রচলন করেছিলেন।

এইজন্য প্রায় দুশ’ বছর ধরে সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। সম্রাটেরা অনেক বড় বড় রাস্তাঘাট, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ করান, এবং খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা করেন। নাগরিকদের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকেও তাঁদের দৃষ্টি ছিল। রাস্তার ধারে ধারে নর্দমা তৈরী করা হত। বড় বড় শহরে জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের ব্যবস্থা ছিল।

সম্রাটদের রাজত্বকালে রোমানদের মধ্যে অনেক বড় বড় সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে কবি ভার্জিল ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি অগাষ্টাসের সমসাময়িক ছিলেন। কথিত আছে যে, ট্রয় ধ্বংসের পর ইনিয়াস নামে একজন বীর ট্রোজানদের নিয়ে ইটালীতে আসেন এবং সেখানে একটি নতুন শহর গড়ে বসতি স্থাপন করেন। ভার্জিল এই গল্পটি অবলম্বন করে হোমারের মত একখানি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন,—তার নাম হল “ইনিড”। লিভি নামে একজন ঐতিহাসিক এই সময়ে রোমের সৃষ্টি থেকে অগাষ্টাসের রাজত্ব-কাল পর্যন্ত বর্ণনা করে একখানি ইতিহাস রচনা করেন। ট্যাসিটাস নামে আর একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক রোম সাম্রাজ্যের গোড়ার দিকের ইতিহাস লিখে যশস্বী হয়েছেন। জার্মান জাতির সবচেয়ে প্রাচীন ইতিহাসও আমরা এই ট্যাসিটাসের লেখা থেকে জানতে পারি। ভারতের সঙ্গে এই সময়ে রোমের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। স্ট্র্যাবো নামে এই যুগের একজন গ্রীক লেখকের বই থেকে জানা যায় যে, সে যুগের একজন ভারতীয় রাজা সম্রাট অগাষ্টাসের কাছে কতকগুলি অদ্ভুত উপহার পাঠিয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিল কতকগুলি বড় বড় সাপ, গণ্ডার, কচ্ছপ আর এমন একটি মানুষ যার জন্ম থেকেই হাত ছিল না।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের লোকেরা পশ্চিমের দেশগুলির

সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। রোমানরা পশ্চিম এশিয়া ও মিশরে সাম্রাজ্য বিস্তার করার পর এই ব্যবসা-বাণিজ্যের আরও প্রসার হয়। ভারতবাসীরা তখন তাদের পণ্যদ্রব্য নিয়ে লোহিত সাগরের মোহানা পর্যন্ত যেত। আবার রোম সাম্রাজ্যের বণিকেরাও সাগর পাড়ি দিয়ে আমাদের দেশে আসত। এদেশের বণিকেরা মসলিন, হাতীর দাঁত, সুগন্ধি মশলা, কার্পাস ও রেশমের কাপড় প্রভৃতি বিদেশে পাঠাত, তার বদলে তারা আমদানি করত তামা, টিন, প্রবাল, কাঁচ, রূপার বাসনপত্র, আর গান গাইবার জন্য ছোট ছোট ছেলে। রোমের লোকদের কাছে তখন ভারতের জিনিসের খুবই আদর ছিল। প্লিনি নামে একজন রোমান লেখকের বই থেকে জানা যায় যে, এইসব জিনিস রোমানরা সোনা দিয়ে কিনে নিত।

পশ্চিম ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্য প্রায় পাঁচশ' বছর স্থায়ী হয়েছিল। তারপর জার্মান জাতির লোকেরা এসে রোম জয় করে নেয়।

যুগরেখা

খ্রীঃ পূঃ ৪৪	খ্রীঃ পূঃ ২৭	খ্রীঃ পূঃ ১৪	০
সীজারের হত্যা	রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা	অগাষ্টাসের মৃত্যু	যীশুখ্রীষ্টের জন্ম

প্রশ্ন

১। রোমের শাসন-ব্যবস্থা কেন ভেঙ্গে পড়ে?
২। জুলিয়াস সীজার কে ছিলেন? তাঁকে কেন হত্যা করা হয়?
৩। কার সময় থেকে রোমে 'সম্রাটদের যুগ' আরম্ভ হয়?
৪। সম্রাটদের রাজত্বকালে কোন্ কোন্ বিষয়ে উন্নতি হয়েছিল?
৫। রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের কি রকম সম্পর্ক ছিল?

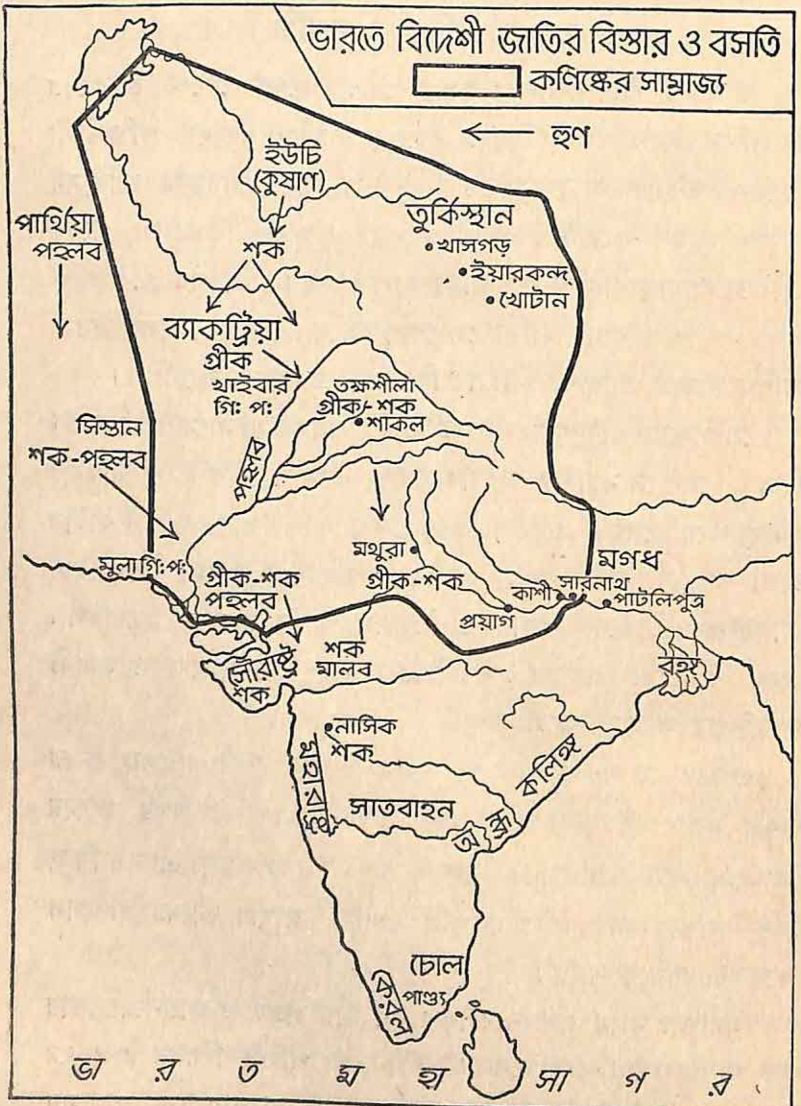
চতুর্দশ অধ্যায়
ভারতের বিদেশী নৃপতি

ভারতের বীর সন্তান চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এদেশ থেকে গ্রীকদের বিতাড়িত করেছিলেন। তাঁর বংশের রাজারা যতদিন শক্তিশালী ছিলেন, ততদিন আর কোনও বিদেশী জাতিই ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে সাহস করেনি। কিন্তু অশোকের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই গ্রীকরা আবার ভারতে এসে রাজ্য স্থাপন করে। তারপর একে একে শক, পহ্লব ও কুষাণ জাতির লোকেরা আসে। এরা সকলেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল।

সে সময়ের হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তরে ব্যাক্‌ট্রিয়া নামে একটি রাজ্য ছিল। সেখানে মহাবীর আলেকজাণ্ডার একদল গ্রীক সৈন্য রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এদের একজন নেতা ব্যাক্‌ট্রিয়াতে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর এই ব্যাক্‌ট্রিয়ান গ্রীকরাই পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ অধিকার করে নিয়েছিল। এমন কি এদের একজন রাজা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র আক্রমণ করেছিলেন।

ভারতে যে সব গ্রীক রাজা রাজত্ব করতেন তাঁরা অনেক সুন্দর সুন্দর মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। এই মুদ্রাগুলির উপর তাঁদের নিজেদের নাম আর মূর্তির ছাপ থাকত। এইসব মুদ্রা এখনও কিছু কিছু পাওয়া যায় এবং সেগুলি থেকেই আমরা তাদের ইতিহাস অনেকটা জানতে পারি।

মিনাণ্ডার নামে একজন গ্রীক রাজা তাঁর বীরত্ব ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি খুব পণ্ডিত ছিলেন এবং ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করতে ভালবাসতেন। শোনা যায় যে, নাগসেন



ভারতে বিদেশী জাতির বিস্তার ও বসতি
কণিষ্কের সাম্রাজ্য
হুণ
ইউচি
(কুষাণ)
শক
পার্থিয়া
পহ্লব
তুর্কিস্থান
খাসগড়
ইয়ারকন্দ
খোটান
ব্যাকট্রিয়া
গ্রীক
খাইবার
গি: প:
তক্ষশীলা
গ্রীক-শক
শাকল
সিস্তান
শক-পহ্লব
পহ্লব
মথুরা
গ্রীক-শক
মগধ
মুলাগি:প:
গ্রীক-শক
পহ্লব
কাশী
সারনাথ
পাটলিপুত্র
প্রয়াগ
শক
মালব
সৌরাষ্ট্র
শক
বঙ্গ
নাসিক
শক
কলিঙ্গ
সাতবাহন
অন্ধ্র
চোল
পাণ্ড্য
ভা র ত ম হা সা গ র

নামে একজন আচার্যের কাছে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। গুরুর সঙ্গে মিনাণ্ডারের যে আলোচনা হত তা নিয়ে পালি ভাষায় একখানা বই লেখা হয়েছিল। গ্রন্থখানির নাম "মিলিন্দ পঞ্‌হো" অর্থাৎ মিলিন্দ বা মিনাণ্ডারের প্রশ্ন। বৌদ্ধ দর্শনের অনেক কথা এই গ্রন্থখানিতে আছে।

গ্রীক রাজাদের পরস্পরের মধ্যে মোটেই সদ্ভাব ছিল না। ফলে শক, পহ্লব ও কুষাণেরা এসে তাঁদের রাজ্য জয় করে নেয়। শকরা প্রথমে ব্যাক্‌ট্রিয়া রাজ্যের উত্তরে তুর্কিস্থানে বাস করত। ইউচি নামে একটি বিদেশী জাতির আক্রমণে তারা দক্ষিণ দিকে চলে আসে। শকরা পশ্চিম ভারতে কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করেছিল।

শকদের পরেই আসে পহ্লবরা। তারা পারস্যদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে রাজত্ব করত। ব্যাক্‌ট্রিয়ার গ্রীকরা দুর্বল হয়ে পড়েছে দেখে তারা পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তার করতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে ভারতবর্ষের সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত সমস্ত দেশ জয় করে। ভারতে যে সব পহ্লব রাজা রাজত্ব করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে গণ্ডফার্‌নিস ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। কথিত আছে যে, তাঁর রাজত্ব-কালে যীশুখ্রীষ্টের শিষ্য সেণ্ট টমাস খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করবার জন্য ভারতে এসেছিলেন এবং ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে এদেশে একজন রাজার হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

কুষাণেরা প্রথমে চীনদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বাস করত। এরা ছিল ইউচি জাতির একটি শাখা। অন্য একটি জাতির কাছে পরাজিত হয়ে ইউচিরা তাদের বাসস্থান ছেড়ে ব্যাক্‌ট্রিয়াতে চলে আসে। এদের মধ্যে ক্রমে কুষাণেরাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

ভারতে প্রবেশ করে কুষাণেরা কাশী পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেছিল। তাদের সবচেয়ে বেশী উন্নতি হয় কনিষ্কের রাজত্বকালে। তিনিই

ছিলেন কুষাণ-রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। রাজ্যবিস্তারের জন্য তিনি অনেক যুদ্ধ করেছিলেন। একবার চীন দেশের সম্রাটের সঙ্গেও তাঁর যুদ্ধ হয়। চীন সম্রাটের কাছ থেকে কণিষ্ক পূর্ব তুর্কিস্তানের কিছু অংশ কেড়ে নিয়েছিলেন।

কনিষ্ক পুরুষপুরে (এখনকার পেশাওয়ার) রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। সেখানে বুদ্ধদেবের পবিত্র অস্থির উপর তিনি একটি বিশাল চৈত্য নির্মাণ করেন। চৈত্যটির কারুকার্য ছিল অপূর্ব। ফা-হিয়েন, হিউএন সাঙ, অলবেরুণী প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকেরা এর অজস্র প্রশংসা করে গিয়েছেন। এই সময়ে তক্ষশীলা এবং মথুরাও খুব সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। কুষাণ রাজারা এই শহর দুটিতে সুন্দর সুন্দর মঠ, মন্দির, মূর্তি ও স্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন।



গণ্ডফার্নিসের মুদ্রা



মিনাণ্ডারের মুদ্রা

অশোকের মত কণিষ্কেরও বৌদ্ধধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। তখন বৌদ্ধদের মধ্যে নানারকম মতের সৃষ্টি হয়েছিল। এর মীমাংসা করবার জন্য কণিষ্ক বৌদ্ধ পণ্ডিতদের এক সভা আহ্বান করেন। অনেক দিন ধরে আলোচনা করে পণ্ডিতেরা তাঁদের মতামত প্রকাশ করলেন। সেইসব মতামত একটি তামার পাতে লিখিয়ে কণিষ্ক তার উপর একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন।

কণিষ্ক বিদ্বানদের খুব সমাদর করতেন। তাঁর সভায় দুজন খুব বড় বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। একজনের নাম অশ্বঘোষ, আর একজনের

নাম নাগার্জুন। অশ্বঘোষ ছিলেন একাধারে কবি, নাট্যকার ও সঙ্গীতজ্ঞ। বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনী নিয়ে তিনি একখানি অতি সুন্দর সংস্কৃত কাব্য রচনা করেছিলেন; এর নাম "বুদ্ধচরিত"। নাগার্জুন ছিলেন খুব বড় দার্শনিক। তিনি মহাযান ধর্মমতের প্রবর্তন করেন। প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক চরক কণিষ্কের রাজবৈদ্য ছিলেন।



কণিষ্কের মুদ্রা

যে সমস্ত বিদেশী জাতি ভারতে এসে বসবাস স্থাপন করেছিল, তারা অনেকে ভারতীয় নাম গ্রহণ করেছিল এবং হিন্দু বা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল। এইভাবে তারা ক্রমে ভারতীয়দের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। মিনাণ্ডার এবং কণিষ্ক যে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন তা আমরা আগেই বলেছি। কণিষ্কের একজন বংশধরের নাম ছিল বাসুদেব। তিনি ছিলেন শিবের উপাসক।

এখানে রাজত্ব করতে এসে বিদেশীরাই যে শুধু ভারতীয় হয়ে গিয়েছিল তাই নয়; ভারতবাসীরাও তাদের কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী। কুষাণ যুগে এদেশে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার প্রভাব বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময় থেকেই উত্তর-পশ্চিম ভারতের ভাস্করেরা গ্রীক দেবতাদের অনুকরণে বুদ্ধদেবের মূর্তি তৈরী করতে আরম্ভ করে। রোমান মুদ্রার অনুকরণে কুষাণ রাজারা অনেক সুন্দর সুন্দর মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। বিদেশীদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে বৌদ্ধধর্মের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। বৌদ্ধরা প্রথম দিকে কোন দেবতার পূজা করতেন না। কিন্তু কুষাণ যুগে বুদ্ধদেবকে দেবতার আসনে বসান হয়েছিল। তা'ছাড়া বিদেশীরা খুব সম্ভব বুদ্ধের মূর্তি গড়ে

পূজা করবার নিয়ম প্রথম প্রচলন করেছিল। বৌদ্ধধর্মের এই নতুন মতের নাম হয় 'মহাযান', আর পুরানো মতের নাম হয় 'হীনযান'। মহাযান ধর্মমত কুষাণ যুগে চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

যুগরেখা

খ্রীঃ পূঃ				খ্রীষ্টাব্দ	
১৮৭	আঃ ১৭০	আঃ ৬০	০	আঃ ৫০	৭৮
মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন	মিনাণ্ডার	উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে শক-রাজ্য স্থাপন	যীশুখ্রীষ্টের জন্ম	গণ্ডফার্নিস্	কণিষ্ক (শকাব্দের আরম্ভ)

প্রশ্ন

১। গ্রীকরা ভারতে কতদূর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিল? মিনাণ্ডার সম্বন্ধে কি জান?

২। শক এবং পহ্লবদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল? গণ্ডফার্নিসের রাজত্বকালে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ কর।

৩। কুষাণরা প্রথমে কোথায় বাস করত? তারা ভারতে কতদূর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিল? কুষাণ রাজাদের মধ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন? বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি কণিষ্কের অনুরাগের কি কি প্রমাণ পাওয়া যায়? কণিষ্কের সভার দুজন বৌদ্ধ পণ্ডিতের নাম কর।

৪। বিদেশীরা কি ভাবে ভারতীয়দের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল? ভারতীয়রা বিদেশীদের কাছে কোন্ কোন্ বিষয়ে ঋণী? কুষাণযুগে বৌদ্ধধর্মের কি পরিবর্তন হয়েছিল? বৌদ্ধধর্মের পুরানো ও নতুন রূপের কি নাম দেওয়া হয়েছিল? কোন্ সময়ে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল?

পঞ্চদশ অধ্যায়

যীশুখ্রীষ্ট

রাজা সলোমনের মৃত্যুর পর ইহুদীদের বড়ই দুর্দশায় পড়তে হয়েছিল। নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার ফলে তাদের রাজ্য দু'ভাগ হয়ে যায়। দক্ষিণভাগের নাম হয় জুডিয়া, আর উত্তরভাগের নাম হয় ইস্রায়েল। তাদের এই গৃহবিবাদের সুযোগ নিয়ে এক একবার একেক জাতির লোকেরা এসে তাদের উপর রাজত্ব করতে থাকে। ফলে তারা তাদের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। সবার শেষে আসে রোমানরা। তাদের আর কেউ সরাতে পারল না; ইহুদীদেরও কষ্টের আর সীমা রইল না।

বহুকাল থেকে একটা কথা চলে এসেছিল যে, ইহুদীদের মধ্যে এমন এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন, যিনি তাদের সব দুঃখ দূর করে দেবেন। সেই আশাতেই তারা বেঁচে ছিল। অক্টেভিয়ান যখন রোমের সম্রাট, তখন ইহুদীদের মধ্যে সত্যিই এক মহাপুরুষের জন্ম হয়। তিনি হলেন খ্রীষ্টান ধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রীষ্ট,—বা ত্রাণকর্তা যীশু।

প্যালেষ্টাইনে নাজারেথ শহরে যোসেফ নামে এক গরীব ছুতার বাস করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল মেরী। যীশু এঁদেরই সন্তান। তাঁর জন্মের আগে যোসেফ একদিন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বেথলেহেম গ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানে এক পান্থশালার আস্তাবলে তৃণশয্যার উপর যীশুর জন্ম হয়। গল্প আছে যে, যীশুর জন্ম হওয়ার পর দূর দেশের কয়েকজন জ্ঞানী লোক তা জানতে পেরেছিলেন এবং বেথলেহেমে এসে যীশুকে "ইহুদীদের রাজা" বলে বন্দনা করেছিলেন। আকাশের একটি তারা নাকি তাঁদের পথ দেখিয়ে এনেছিল। জুডিয়ার শাসনকর্তা হেরড একথা জানতে পেরে

যীশুকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যোসেফ ও মেরী মিশরে পালিয়ে গিয়ে যীশুর প্রাণরক্ষা করেন।

দরিদ্র পরিবারে জন্ম হয়েছিল বলে যীশু লেখাপড়া বিশেষ শিখতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর বুদ্ধি ছিল খুব তীক্ষ্ণ; আর ধর্মের প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল প্রবল। অল্প বয়স থেকেই তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করতেন।

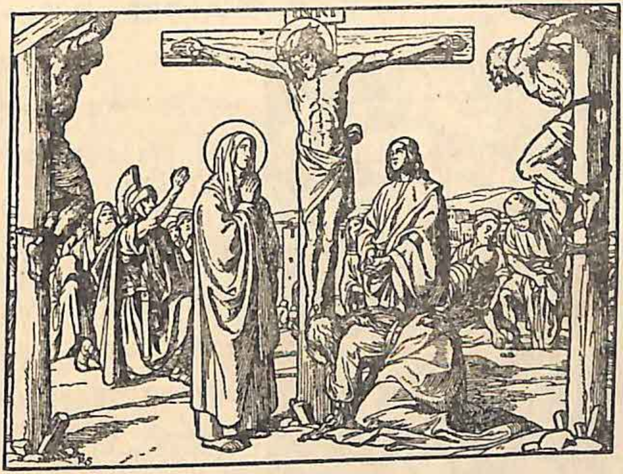
এই সময় জুডিয়া প্রদেশের গহন বনে যোহন নামে এক সাধুপুরুষ বাস করতেন। তিনি প্রচার করছিলেন যে, শীগগিরই এমন একজন মহাপুরুষ আসবেন যিনি পৃথিবীতে নিয়ে আসবেন স্বর্গরাজ্য। লোকে যাতে সেই মহাপুরুষকে সহজেই চিনে নিতে পারে সেজন্য যোহন সকলকে জর্ডন নদীর জলে স্নান করে সমস্ত পাপ ধুয়ে ফেলতে বলতেন। তারপর নতুন জীবন লাভ করবার জন্য তিনি তাদের সকলকে দীক্ষা দিতে থাকেন। এই রকম ভাবে দীক্ষা দেওয়াকে বলা হত "ব্যাপটিজম্"। যোহনের কথা শুনে যীশুও তাঁর নিকট দীক্ষা নিলেন।

এর কিছুদিন পরে রাজা হেরডের এক ছেলে যোহনকে বন্দী করলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে মেরে ফেললেন। যোহনের মৃত্যুর পর তাঁর কাজের ভার যীশু নিজে নিলেন। তিনি সকলকে উপদেশ দিতে লাগলেন :—"ঈশ্বরকে ভালবাস; মানুষ মাত্রেই ঈশ্বরের সন্তান, তাই প্রত্যেককে নিজের ভাই মনে করে স্নেহ করবে; ভালবেসে শত্রুর হৃদয় জয় করবে; অপকারের বদলে করবে উপকার; কেউ যদি তোমার ডান গালে চড় মারে, তাহলে তোমার বাঁ গালটি তাঁর দিকে ফিরিয়ে দেবে, আর সৎজীবন যাপন করে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলবে।"

রুগ্নকে সুস্থ করে, অন্ধকে চক্ষুদান করে, মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত

করে যীশু ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা প্রমাণ করলেন। অনেক লোকই তাঁর শিষ্য হল। এঁদের মধ্যে বারো জন ছিলেন তাঁর বিশেষ প্রিয়।

যীশুর ধর্ম-প্রচারের ফলে ইহুদীদের প্রাচীন সমাজ ও পুরোহিত-দের ক্ষমতা নষ্ট হবার উপক্রম হল। তাই ইহুদী পুরোহিতেরা যীশুকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করতে লাগল। একবার যীশু যখন জেরুজালেম নগরে যান, তখন কতকগুলি লোক তাঁকে "ইহুদীদের রাজা" বলে



ক্রুশবিদ্ধ যীশু

প্রচার করে। এতে যীশুর শত্রুদের আরও সুবিধা হল। তারা প্যালেষ্টাইনের শাসনকর্তা পাইলেটের কাছে নালিশ জানাল যে যীশু রাজদ্রোহী, তিনি নিজেই রাজা হতে চান। জুডাস নামে যীশুর এক বিশ্বাসঘাতক শিষ্য সামান্য অর্থের বিনিময়ে যীশুকে ধরিয়ে দিল। বিচারে আদেশ দেওয়া হল যে, যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হবে। ইহুদীরা তখন যীশুকে নানারকম লাঞ্ছনা ও অপমান করল।

রোমান সৈন্যরা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিল কাঁটার মুকুট, আর চাবুকের ঘা দিয়ে তাঁর সর্ব শরীর রক্তে রাঙিয়ে দিল। শেষে তারা তাঁকে নিয়ে গেল কলভেরি পাহাড়ের ওপর। যীশু নিজেই ক্রুশকাঠ বহন করে নিয়ে গেলেন। দু'জন চোরের মাঝখানে তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করে মেরে ফেলা হল। এইভাবে যাদের মঙ্গলের জন্য এই মহাপুরুষ তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তারাই তাঁকে নৃশংস ভাবে হত্যা করল। কিন্তু মৃত্যুর সময়েও তিনি অপরাধীদের জন্য ঈশ্বরের কাছে এই বলে প্রার্থনা জানালেন, "হে আমার ঈশ্বর, এরা কি করছে তা জানে না। প্রভু, তুমি এদের ক্ষমা কর।"



সম্রাট কনস্ট্যানটাইন

যীশুর স্বর্গলাভের পর তাঁর প্রধান শিষ্যেরা দেশে দেশে তাঁর মহান্ উপদেশগুলি প্রচার করতে লাগলেন। এজন্য তাঁদের বহু অত্যাচার ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। রোমান সম্রাটদের আদেশে তখন খ্রীষ্টানদের পুড়িয়ে মারা হত; কখনও কখনও বা হিংস্র জন্তুর মুখে ফেলে দেওয়া হত। সম্রাটেরা ভাবতেন, এতে ভয় পেয়ে আর কেউ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হবে না। কিন্তু খ্রীষ্টানদের অপূর্ব ধর্মনিষ্ঠা আর সাহস দেখে রোমানদের মধ্যে অনেকে এই ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগল।

যীশুর স্বর্গারোহণের তিনশ' বছর পরে রোমান সম্রাট কনস্ট্যানটাইন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। এর পর থেকে এই ধর্ম প্রচারের পথে আর কোন বাধা রইল না। ক্রমে ক্রমে সমস্ত রোম-সাম্রাজ্যেই খ্রীষ্টধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল।

কালক্রম

খ্রীঃ ৩৩—যীশুখ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ
খ্রীঃ ৩৬৭-৩৭৬—সম্রাট কনস্ট্যানটাইনের রাজত্বকাল

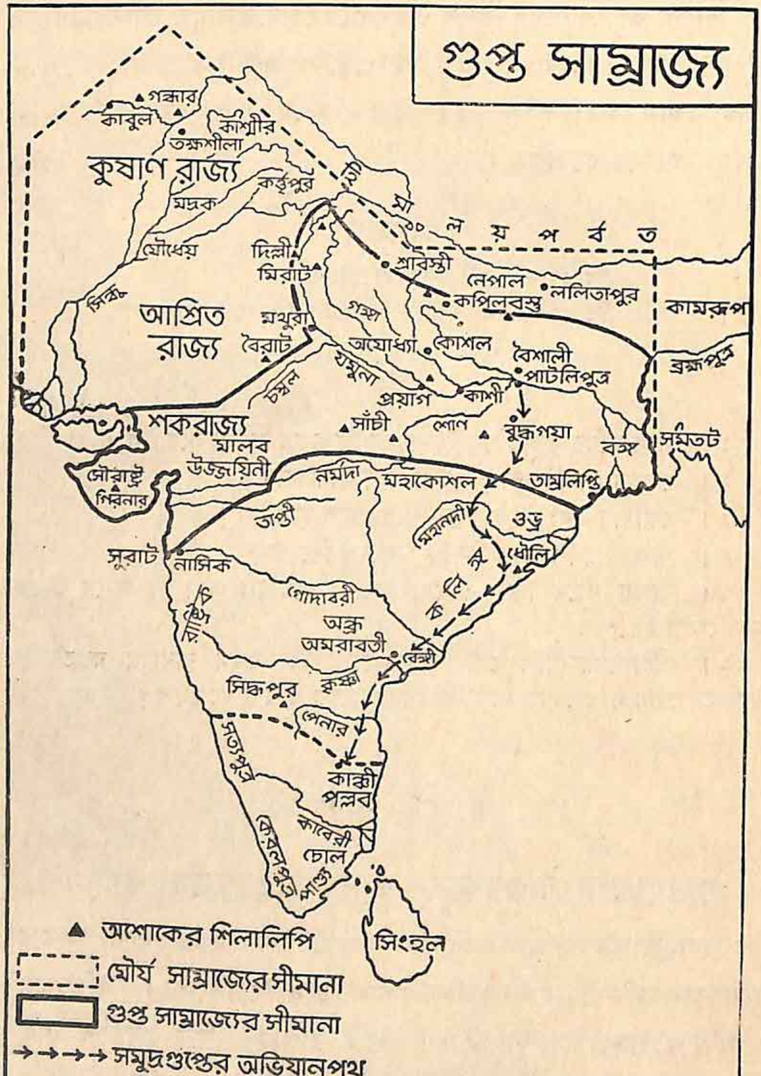
প্রশ্ন

১। সলোমনের মৃত্যুর পর ইহুদীদের কি রকম অবস্থা হয়েছিল ?
২। যোহন কে ছিলেন ? তাঁর সম্বন্ধে কি জান ?
৩। কোথায় এবং কি অবস্থায় যীশুর জন্ম হয়েছিল ?
৪। যীশু তাঁর শিষ্যদের কি কি উপদেশ দিতেন ?
৫। যীশুর নামে কি অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং কি ভাবে তাঁকে মেরে ফেলা হয় ?
৬। খ্রীষ্টানদের প্রতি রোমান সম্রাটেরা কি রকম ব্যবহার করতেন ? কি ভাবে রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সুবিধা হয়েছিল ?

ষোড়শ অধ্যায়

গুপ্তবংশের রাজত্বকাল—ভারত ইতিহাসের স্বর্ণযুগ

কুষাণবংশের রাজা কণিষ্কের রাজত্বে দুশ' বছর পরে আবার কয়েকজন ভারতীয় রাজা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। ইতিহাসে এঁরা গুপ্ত রাজা বলে পরিচিত। গুপ্ত রাজারা উত্তর ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। মৌর্যদের মত তাঁরাও প্রথমে মগধের রাজা ছিলেন।



গুপ্ত সাম্রাজ্য
গন্ধার
কাবুল
কাশ্মীর
তক্ষশীলা
কুষাণ রাজ্য
কর্তৃপুর
মদ্রক
যৌধেয়
দিল্লী
মিরাট
শ্রাবস্তী
নেপাল
ললিতাপুর
কপিলবস্তু
কামরূপ
সিন্ধু
আশ্রিত রাজ্য
মথুরা
গঙ্গা
বৈরাট
অযোধ্যা
কোশল
বৈশালী
পাটলিপুত্র
ব্রহ্মপুত্র
চম্বল
যমুনা
প্রয়াগ
কাশী
শকরাজ্য
সাঁচী
শোণ
বুদ্ধগয়া
সমতট
মালব
বঙ্গ
সৌরাষ্ট্র
উজ্জয়িনী
নর্মদা
মহাকোশল
তাম্রলিপ্তি
গির্নার
তাপ্তী
মহানদী
ওড্র
সুরাট
নাসিক
ধৌলি
গোদাবরী
কলিঙ্গ
অন্ধ্র
অমরাবতী
বেঙ্গী
সিদ্ধপুর
কৃষ্ণা
পেনার
কাঞ্চী
পল্লব
কাবেরী
চোল
সিংহল
▲ অশোকের শিলালিপি
মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমানা
গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমানা
→→→→ সমুদ্রগুপ্তের অভিযানপথ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সভাকবি হরিষেণ সেই সব গুণ বর্ণনা করে একটি প্রশস্তি রচনা করেছিলেন; সেটি একটি পাথরের থামে খোদাই করা আছে। এই প্রশস্তিটি থেকে জানা যায় যে, সমুদ্রগুপ্ত খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন, তা ছাড়া তিনি কবিতা লিখতেন, ভাল বীণা বাজাতেন এবং নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।



সমুদ্রগুপ্ত



দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

রাজা হবার পরই সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ে বার হলেন এবং উত্তর ভারতের কয়েকজন রাজাকে পরাজিত করে তিনি যমুনা ও চম্বল নদী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করলেন। এরপর তিনি দাক্ষিণাত্যে যান। সেখানেও বারোজন রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অধীনতা স্বীকার করবার পর তিনি তাঁদের রাজ্যগুলি ফিরিয়ে দেন। সমুদ্রগুপ্তের অদ্ভুত রণকৌশল আর শক্তি দেখে একদিকে পূর্ববঙ্গ, আসাম ও নেপাল এবং অন্য দিকে পঞ্জাব, রাজপুতানা ও পূর্ব-মালবের ছোট ছোট রাজ্যগুলি বিনাযুদ্ধেই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। শুধু তাই

নয়, পশ্চিম ভারত ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শক ও কুষাণ রাজারা এবং সিংহলের রাজা মেঘবর্ণও তাঁর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেছিলেন। একমাত্র অশোক ছাড়া ভারতের আর কোন রাজাই এত শক্তিশালী হতে পারেন নি।

দিগ্বিজয় শেষ করে সমুদ্রগুপ্ত মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। এর স্মৃতিরক্ষার জন্য তিনি অশ্বের মূর্তি খোদাই করা স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত রাজা হন। তিনিও পিতার মত বীর ও তেজস্বী ছিলেন। পশ্চিম ভারতের শক রাজাকে পরাজিত ও নিহত করে তিনি আরব সাগর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তারপর মালব দেশের উজ্জয়িনী নগরে তিনি একটি নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত "বিক্রমাদিত্য" অর্থাৎ সূর্যের মত তেজস্বী উপাধি নিয়েছিলেন।

বিক্রমাদিত্য নামে একজন রাজার সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তিনিও উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করতেন এবং 'শকারি' অর্থাৎ শকদের শত্রু উপাধি নিয়েছিলেন। তাঁর সভায় ন'জন বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন, এঁদের বলা হত নবরত্ন। অনেকে বলেন যে, গল্পের এই বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ছাড়া আর কেউই নন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ফা-হিয়েন নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু চীন দেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন। এদেশে তিনি যা কিছু দেখেছিলেন তা বর্ণনা করে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এর থেকে জানা যায় যে, ভারতবাসীরা তখন সুখে-শান্তিতে বাস করত এবং নির্ভয়ে যেখানে খুশি যেতে পারত। ফা-হিয়েন সে যুগের শাসন-ব্যবস্থারও প্রশংসা করেছেন : রাজকর্মচারীরা অযথা কারও উপর

অত্যাচার করত না। প্রজাদের কাছ থেকে রাজা অতি সামান্যই কর নিতেন। অপরাধীদের খুব কঠিন শাস্তি দেওয়া হত না, তবে বার বার গুরুতর অপরাধ করলে হাত-পা কেটে ফেলা হত।

গুপ্ত যুগে ভারতীয়রা রোম সাম্রাজ্য, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। তাই দেশ ধনসম্পদে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

গুপ্ত রাজারা ছিলেন হিন্দু। সাধারণ লোকেদের মধ্যেও বেশীর ভাগ হিন্দু ছিল। কিন্তু গুপ্ত যুগের হিন্দুধর্মের সঙ্গে প্রাচীন বৈদিক ধর্মের অনেকখানি তফাৎ হয়ে গিয়েছিল। আগে দেবতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি ; এখন প্রধান হলেন বিষ্ণু, শিব, কার্তিক, দুর্গা, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবদেবী। বৈদিক যুগে দেবতাদের উদ্দেশে যে সব যাগযজ্ঞ করা হত, সেগুলিও ক্রমে উঠে যেতে থাকে। কারণ লোকেরা বুঝতে শিখেছিল যে, দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে জাঁকজমক ও পশুবলির প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় ভক্তি ও ভালবাসার।

এই সময়ে হিন্দু ধর্মের প্রসার হলেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব একেবারে নষ্ট হয়ে যায় নি। তার প্রমাণ ফা-হিয়েনের গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। ফা-হিয়েন কপিলবস্তু, কুশিনারা, বুদ্ধগয়া, সারনাথ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বৌদ্ধ তীর্থে ভ্রমণ করেছিলেন। এই সব তীর্থস্থানে তিনি অনেক বড় বড় স্তূপ ও বৌদ্ধ-বিহার দেখেছিলেন। গুপ্ত রাজাদের রাজধানী পাটলিপুত্রেও দুটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। সেখানে শিক্ষালাভ করবার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্ররা আসত। পাটলিপুত্রের একটি বিহারে প্রতি বৎসর এক বিরাট উৎসব হত, সেটা ছিল অনেকটা রথযাত্রার মেলার মত। বড় বড় বাঁশ দিয়ে একটি রথ তৈরী করা হত, আর সেই রথের মধ্যে বুদ্ধদেব ও

অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি রেখে বিরাট শোভাযাত্রা করা হত। দেশের মধ্যে অনেক রকমের ধর্মমত প্রচলিত থাকলেও কারও প্রতি কারও বিদ্বেষ ছিল না। যে যার ধর্মমত নিয়ে সুখে-শান্তিতে দিন কাটাত।

গুপ্তযুগে সংস্কৃত সাহিত্যের খুবই উন্নতি হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস এই যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর লেখা "শকুন্তলা" নাটকখানি দেশ-বিদেশে সুখ্যাতি লাভ করেছে। মহাভারতে শকুন্তলা সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে। দুষ্মন্ত নামে এক রাজা মৃগয়ায় বেরিয়ে কণ্বমুনির তপোবনে আসেন। কণ্বমুনি তখন আশ্রমে ছিলেন না। তাঁর পালিত-কন্যা শকুন্তলা রাজাকে অভ্যর্থনা করেন। শকুন্তলার রূপ-গুণে মুগ্ধ হয়ে দুষ্মন্ত তাঁকে বিয়ে করলেন। তারপর কয়েকদিন তপোবনে থেকে রাজা রাজধানীতে ফিরে গেলেন; কথা রইল যে শকুন্তলাকে পরে নিয়ে যাবেন। যাবার সময়ে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে নিজের নাম-লেখা একটি আংটি দিয়ে যান। এদিকে একদিন মহা অভিমানী দুর্বাসা ঋষি সেই তপোবনে এসে উপস্থিত হলেন এবং আশ্রমবাসীদের উদ্দেশ করে ডাক দিলেন। কিন্তু শকুন্তলা তখন রাজার কথা ভাবছিলেন বলে ঋষির কোনো কথাই তাঁর কানে গেল না। ঋষি ভাবলেন, শকুন্তলা তাঁকে অবজ্ঞা করেছেন। রাগে তিনি শকুন্তলাকে অভিশাপ দিলেন, "যার কথা ভেবে তুই আমাকে অবজ্ঞা করলি, সে তোকে চিনতেই পারবে না।" শকুন্তলার দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা অনেক চেষ্টা করে ঋষিকে প্রসন্ন করলেন। মুনি তখন বললেন যে, শকুন্তলা যদি রাজাকে তাঁর দেওয়া কোন জিনিস দেখাতে পারেন তাহলে রাজা আবার তাঁকে চিনতে পারবেন। এর কয়েকদিন পরে কণ্বমুনির দুজন শিষ্যকে নিয়ে শকুন্তলা দুষ্মন্তের সভায় গেলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য-

ক্রমে পথে নদীতে স্নান করতে গিয়ে রাজার দেওয়া আংটিটি তিনি হারিয়ে ফেলেন। মুনির শাপে দুষ্মন্ত তাঁকে চিনতে পারলেন না। শকুন্তলাও রাজার দেওয়া আংটিটি দেখাতে পারলেন না। অপমানে দুঃখে ক্ষোভে শকুন্তলা রাজসভা ছেড়ে চলে গেলেন। পরে আংটিটি পাওয়া গেলে দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার মিলন হয়েছিল। এই কাহিনী নিয়ে কালিদাস তাঁর বড় সুন্দর নাটকখানি লিখে গেছেন।

কালিদাসের লেখা 'মেঘদূত', 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব' প্রভৃতি কাব্যগুলিও সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

শূদ্রক, বিশাখদত্ত, ভারবি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকারেরাও গুপ্ত যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শূদ্রকের লেখা নাটকখানির নাম 'মৃচ্ছকটিক'। এতে চারুদত্ত নামে একজন বণিক ও বসন্তসেনার বৃত্তান্ত আছে। বিশাখদত্ত 'মুদ্রারাক্ষস' নামে একখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন। নন্দবংশ ধ্বংসের পর চাণক্য কি রকম কৌশল করে নন্দরাজের মন্ত্রী রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে এনেছিলেন সেই ঘটনা নিয়ে এই নাটকখানা লেখা হয়েছে। ভারবি 'কিরাতার্জুনীয়' নামে একখানি কাব্য লিখে যশস্বী হয়েছিলেন। কিরাত বা ব্যাধের ছদ্মবেশ ধরে শিব একবার অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং খুশী হয়ে অর্জুনকে বর ও অস্ত্র দান করেন। মহাভারতের এই কাহিনী নিয়ে ভারবি কাব্য রচনা করেছিলেন।

নাটক আর কাব্য ছাড়া অনেক "স্মৃতি" এবং "পুরাণও" এই সময়ে সঙ্কলিত হয়েছিল। গৃহস্থের কি ভাবে জীবনযাপন করা উচিত— স্মৃতিগুলিতে সে বিষয়ে অনেক উপদেশ আছে। পুরাণগুলি থেকে দেবদেবীর উপাখ্যান, প্রাচীন রাজাদের ইতিহাস এবং নানারকম আচার-ব্যবহার ও ধর্মকর্মের কথা জানা যায়।

রামায়ণ ও মহাভারত অতি প্রাচীন কালেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু তখন এই মহাকাব্য দুখানি ছিল অনেক ছোট। পরে এতে আরও অনেক নতুন বিষয় যোগ করা হয়। এখন আমরা যে বড় রামায়ণ আর মহাভারত দেখতে পাই তার সঙ্কলনও গুপ্তযুগে হয়েছিল।



অজন্তার একটি গুহা

এই যুগের একটি অপূর্ব সৃষ্টি অজন্তা গুহার চিত্রাবলী। বৌদ্ধ শ্রমণদের থাকবার জন্য হায়দ্রাবাদ রাজ্যের একটি পাহাড়ের গা কেটে সারি সারি উনত্রিশটি গুহা তৈরী করা হয়েছিল। পর্বতের গুহা বলতে যা বোঝায় এগুলো ঠিক তা নয়। এইসব গুহাতে ছিল বড় বড় হলঘর, বারান্দা, বিরাট বিরাট স্তম্ভ, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের থাকবার ঘর ও পূজার

ঘর। রং ও তুলির সাহায্যে সে যুগের শিল্পীরা বুদ্ধের জীবনী, জাতকের গল্প, রাজসভার দৃশ্য প্রভৃতি গুহাগুলির দেওয়ালে নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। ছবিগুলি দেখলে চোখ ফেরান যায় না। একটি চিত্রে দেখি, ভগবান্ বুদ্ধ ধ্যানে নিমগ্ন; কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ছ'টি রিপু তাঁর ধ্যান ভাঙবার চেষ্টা করছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুদ্ধের কাছে তারা পরাজিত হয়েছে। আর একটি ছবিতে দেখা যায় যে, ভগবান্ বুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন ভিখারীর বেশে; একটি ছেলে তাঁকে ভিক্ষা দিচ্ছে, আর তার মা ছেলের হাত দুখানি ধরে রয়েছেন। এদের সকলের মুখেই অপূর্ব স্বর্গীয় ভাব। এই রকম আরও অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্র আছে। চিত্রশিল্পে ভারতবাসীরা যে কতদূর উন্নতি করেছিল তার প্রমাণ এইসব চিত্র থেকেই আমরা পাই।

গুপ্তদের রাজত্বকাল ভাস্কর্য শিল্পেরও একটি গৌরবময় যুগ। সে সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় অনেক সুন্দর সুন্দর দেব-দেবীর মূর্তি ও মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এ যুগের বুদ্ধমূর্তিগুলি ছিল খাঁটি ভারতীয় আদর্শে গড়া। এই মূর্তিগুলির মধ্যে এমন একটা শান্ত ও স্বর্গীয় ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

শুধু সাহিত্য, চিত্রশিল্প আর ভাস্কর্যেই নয়, গুপ্তযুগে জ্যোতিষ শাস্ত্রেরও খুব প্রসার হয়েছিল। ভারতের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী আর্যভট্ট এই সময়ে সর্বপ্রথম প্রমাণ করেছিলেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং সে নিজের চারদিকে ঘুরছে। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ কেন হয় তাও সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন বরাহমিহির নামে সে যুগেরই আর একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী। ভারতীয় জ্যোতিষীরা গ্রীকদের কাছ থেকে কোন কোন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাই তাঁরা প্রাচীন গ্রীক জ্যোতিষীদের ঋষির মত শ্রদ্ধা করতেন।

এই সময়ে চিকিৎসাবিদ্যারও বেশ উন্নতি হয়েছিল। তখনকার চিকিৎসকরা মৃত জীবজন্তু কেটে দেখতেন তাদের শরীরের কোথায় কি আছে, আর মোমের মানুষ তৈরী করে তার উপর ছুরি চালিয়ে তাঁরা অস্ত্রোপচারে হাত পাকাতেন। গ্রীক এবং আরবরা প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসকদের কাছ থেকে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ রোগ নির্ণয় করতে এবং গাছপালা থেকে নানারকম ওষুধ তৈরী করতে শিখেছিলেন।

গুপ্ত যুগে নানা দিকে ভারতবাসীদের যে রকম উন্নতি হয়েছিল, এর পূর্বে বা পরে আর কখনও সে রকম হয়নি। এইজন্য গুপ্ত যুগকে ভারতীয় সভ্যতার স্বর্ণ যুগ বলা হয়ে থাকে।

কালক্রম

৩০৭ খ্রীঃ অঃ—কনস্ট্যানটাইনকে সম্রাট রূপে ঘোষণা

৩১৯-৩২০ খ্রীঃ—প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন আরোহণ (গুপ্তাব্দের আরম্ভ)

আঃ ৩৩০ খ্রীঃ—সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসন আরোহণ

আঃ ৩৮০ খ্রীঃ—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন আরোহণ

৪০৫-৪১১ খ্রীঃ—ফা-হিয়েনের ভারত ভ্রমণ

প্রশ্ন

১। সমুদ্রগুপ্তকে গুপ্তবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয় কেন? তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে কি জান?

২। 'বিক্রমাদিত্য' উপাধির অর্থ কি? গুপ্তবংশের কোন্ রাজাকে গল্পের বিক্রমাদিত্য বলে মনে করা হয়? তার কারণ কি?

৩। ফা-হিয়েন ভারতবাসীদের সম্বন্ধে কি বিবরণ লিখে গেছেন? সে সময়ে বৌদ্ধধর্মের কি রকম অবস্থা ছিল?

৪। গুপ্তযুগে প্রাচীন বৈদিক ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের কি কি পার্থক্য দেখা দিয়েছিল?

৫। অজন্তা গুহা কোথায়? সেখানে যে সব বিষয়ের বর্ণনা চিত্রে আঁকা আছে তার কিছু বিবরণ দাও।

৬। গুপ্তযুগকে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণ যুগ বলা হয় কেন?

Raichaudhuri and Chakravarti's History, Part I, for Class VI, Bengali.

[redacted]

Price Re. 1·65